

Vol. 9 | No. 2 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জায়সী ও আলাওল কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের তুলনা এবং আলাওল এর ব্যতিক্রম

Volume	9
Issue	2
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	December 16, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i2.1
Pages	1-40
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
নবম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত, ১৩৭২

জায়সী ও আলাওল

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের তুলনা
এবং আলাওলের ব্যতিক্রম

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

॥ ১ ॥

সিংহলে উপনীত হবার পর সিংহলের বিভিন্ন দৃশ্য দেখে রাজা রত্নসেন পুলকিত হলেন।[১] গুরু শুক সিংহলের সঙ্গে রাজাকে পরিচিত করাল। রাজ প্রাসাদ, রাণীনিবাস, মন্দির ইত্যাদি কোন গৃহ কোথায় আছে শুকের কাছ থেকে রাজা তা জানলেন। রাজাকে সর্বপ্রকার নির্দেশ দিয়ে শুক পদ্মাবতীর কাছে রাজার আগমনের সংবাদ পৌঁছে দিল। শুকের অনুপস্থিতিতে রাজা মহাদেব মন্দিরে যেয়ে ব্যাঘ্রচর্মের উপর যোগাসনে বসলেন।

প্রথম স্তবকে আলাওল মূলকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছেন। দুই এক ক্ষেত্রে অর্থের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু প্রধানতঃ সব কয়টি চরণই মূলের সঙ্গে সঙ্গত। প্রথম চরণে মূলে পাই "পূছা রাজৈ কহু গুরু সূআ," বাংলাতে আছে, "নৃপতি কহিল তবে শুন গুরু শুক।" তৃতীয় চরণ মূলে, "পবন বাস সীতল লেই আবা," বাংলাতে "সৌরভ সহিতে আসি

শীতল পবন।" চতুর্থ চরণ মূলে, "পয়া দহন চন্দনু জন্থ লাবা," বাংলাতে, "দহিত অঙ্গেত যেন লাগিল চন্দন।" সপ্তম চরণ মূলে, "নিকসত অব কিরিণ-রবি-রেখা," বাংলাতে, "অন্ধকার দূরে গেল কিরণ উজ্জ্বল।" অষ্টম চরণ মূলে, "তিমির গএ নিরমল জগ দেখা," বাংলাতে "সকল জগত আজি দেখি নিরমল।" নবম চরণ মূলে, "উঠে মেঘ অস জানহুঁ আগৈ," বাংলাতে, "সমুখে মেঘের প্রায় দেখি অদভুত।" মূলে দশম চরণ "চমকৈ বীজু গগন পর লাগৈ," বাংলাতে, "আকাশে লাগিল যেন সুধীর বিদ্যুৎ।" একাদশ চরণ মূলে "তেহি উপর জন্থ সসি পরগাসা," বাংলাতে, "তাহার উপরে যেন চন্দ্রিমা প্রকাশ।" এভাবে চরণে চরণে অগ্রসর হয়ে প্রমাণ করা যায় যে, আলাওল মূলের কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে এবং মূলের বর্ণনারীতি ও উপমাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে এবং সে সঙ্গে বাংলা শব্দ এবং ছন্দ রীতির বিশিষ্টতাকে আহত না করে একটি কুশল অনুবাদ কর্মের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে রাজার গুণাবলীর পরিচয়[২] দিয়ে শুক বলছে যে রাজা সাহসে বিক্রমাদিত্যের সমান, সত্যবাদিতায় হরিশ্চন্দ্রের মত, গোপীচন্দ্রের মত যোগে জয়ী, ভর্তৃহরির মত বিবাগী, গোরঘানাতের মত সিদ্ধা এবং মৎসেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রাজা পেয়েছেন কুঞ্জিকা। আলাওল ভর্তৃহরির কথা বাদ দিয়েছেন। মৎসেন্দ্রনাথের কাছ থেকে কুঞ্জিকা পাবার কথা আলাওলে জ্ঞান লাভ করার কথায় রূপান্তরিত হয়েছে। মূলে যেখানে রাণীনিবাসের কথা আছে আলাওল সেখানে নৃপতির গৃহের কথা বলছেন।

মূলের তৃতীয় স্তবকের মধ্যে রাজদুর্গের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে দুর্গ দুর্ভেদ্য, বিশাল এবং উচ্চতায় আকাশচুম্বী, যে দুর্গের ভয়াবহতা এবং বিশালতা দেখে চন্দ্র সূর্য এবং আকাশের অন্যান্য তারকা আকাশে আপন আপন রাশিকক্ষে চক্রাকারে ঘোরে এবং যে দুর্গের সম্মুখে শঙ্কর মাথা নত করে। আলাওল এ স্তবকের অনুবাদ করেননি।

মূলের চতুর্থ স্তবকে পদ্মাবতী লাভ করার প্রাথমিক কৌশল বর্ণিত হয়েছে। শুক রাজাকে বলছে যে যোগ অবলম্বন করে রাজার পক্ষে পদ্মাবতী

দর্শন লাভ সম্ভবপর হবে সেজন্য মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে[৩] যদি রাজা মহাদেব মণ্ডপে যান তবে সেখানে পদ্মাবতীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটবে। এ স্তবকেও আলাওলের অনুবাদ মূলের অত্যন্ত অনুগত।

মূলের পঞ্চম স্তবকের প্রথম চারিটি চরণ মাত্র আলাওল অনুবাদ করেছেন। মূলের ষষ্ঠ স্তবক আলাওলের পঞ্চম স্তবক, এখানে অনুবাদটি মূলের অনুগত। শুধু একটি চরণে মূলের অর্থে বিকৃতি ঘটেছে। মূলে সেখানে আছে, "ঔ তহঁ লাগি সজীবন মূরী" অর্থাৎ সেখানে সঞ্জীবনী মূল রোপিত হয়েছে, আলাওল তার অর্থ করেছেন, "সজীবন মূর্তি তথা পুরে মন আশ।" পূর্ববর্তী চরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আলাওল মূলের অর্থ নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন। পঞ্চম স্তবকে জায়সীর প্রধান ইঙ্গিত ছিলো জীবনের সর্বক্ষেত্রের উচ্চতার প্রতি। রত্নসেন বলছেন যে পদ্মাবতীর নিবাস যদি অনেক উঁচুতে হ'য়ে থাকে, পর্বতে অথবা আকাশে, তবে দর্শনের জন্য সেখানেও তিনি যাবেন। প্রিয়তম নাম তিনি উচ্চারণ করেন উচ্চৈঃস্বরে। উচ্চকোটি সাহস নিয়েই মানুষ উচ্চস্থানে পা রাখতে পারে। যার উৎসাহ অত্যন্ত উচ্চ, সে প্রতিমুহূর্তে মহান হয়। উচ্চ ভাবনা বা আশার এ-তাৎপর্য্য আলাওল গ্রহণ করেননি।

আলাওলের ষষ্ঠ স্তবক জায়সীর মণ্ডপগমন-খণ্ডের প্রথম স্তবক। আরম্ভের দু'টি চরণের অনুবাদ নেই। মণ্ডপের চতুর্দিকে পরিক্রম ক'রে শিষ্যসহ রাজা দণ্ডবৎ হ'লেন। পূর্বদ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রে আনত শিরে দেবতার সামনে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন 'দেবায় গারায়ণায় নমোনমঃ'। আলাওল-কর্তৃক এ-কথা-গুলোর অনুবর্তন নিম্নরূপ—

"মনে ভাবি পদ্মাবতী দরশন আশ।
মণ্ডলী করিল মণ্ডপের চারি পাশ॥
সিদ্ধি হৈতে তুরিত আপনা মনুরথ।
বৃষধ্বজ সাক্ষাতে হইল দণ্ডবৎ॥
নমঃ নমঃ বৃষধ্বজ নমঃ মহাদেব।
কি মোর শকতি আছে করু তোমা সেব॥"

মূলে যেখানে আছে "কা মৌহিঁ জোগ করৌঁ তেরি সেবা"—আমার এমন কি যোগ আছে অর্থাৎ এমন কোন্ যোগ-সিদ্ধি আমার ঘটেছে যে তোমার সেবা করব? আলাওল সেখানে যোগের পরিবর্তে শক্তির কথা বলছেন। মূলে যেখানে আছে "তুমি দয়াল, সকলের উপরে। কারো সেবার অভিলাষ তোমার নেই।" আলাওল সেখানে বলছেন "তুমি সে সিদ্ধার সিদ্ধি ভকতবৎসল। নৈরাশের আশা তুমি পুরাও সকল॥" আলাওলের বক্তব্য এখানে মূলের উপর নির্ভরশীল কিন্তু সম্পূর্ণ অনুগত নয়। মূলের 'আমার গুণ নেই আমার রসনায় রস-বাক্য নেই," আলাওলের ভাষায় রূপান্তরিত হ'য়েছে "স্তুতিযোগ্য নহে মোর মুখের রসনা।" লক্ষ্যযোগ্য যে রূপান্তরিত বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রেছে। মূলের ভাবানুগত হয়ে যে প্রকৃতির বাণী আলাওল উপস্থিত ক'রেছেন, ছন্দে ও সজ্জায় তা' বাংলা ভাষার ঐতিহ্যে গৃহীত। স্তবকের দোহা-অংশে জায়সী বলছেন—

"তেহি বিধি বিনৈ ন জানৌঁ জেহি বিধি অস্তুতি তোরি।
করহু সুদিষ্টি মোহিঁ পর-হীন্‌ছা পূজৈ মোরি॥"—

"যে-ভাবে তোমার স্তুতি করা উচিৎ, স্তুতির সে-পদ্ধতি আমার জানা নেই। তুমি আমার প্রতি সুদৃষ্টি রেখে আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।"—

ভাবের কোনও প্রকার বিকার না ঘটিয়ে আলাওল এর অনুবাদ করেছেন—

"অস্তুত না জানুঁ মুই যেন মত তোর।
কৃপাল হৈয়া প্রভু ইচ্ছা পুর মোর॥

মূল 'মণ্ডপ-গমন-খণ্ডে'র দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ আলাওলে নেই। এ-স্তবকে জায়সী ব'লছেন যে, হঠাৎ মন্দিরের মধ্যে থেকে শব্দ উচ্চারিত হ'ল, 'প্রেমের প্রশ্রয়ে মানুষ বৈকুণ্ঠের উপযুক্ত হয়, প্রেমবিহীন মানুষ ধূলার সমতূল্য। প্রেমের মধ্যে বিরহরসের স্থিতি যেন মোমের আবরণের মধ্যে মধু। যে মিথ্যাচারী, ধাবমান অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তবে কি ফললাভ হ'ল তার? অন্যপক্ষে যে সত্যভাষী সে যদি পথ না চলে স্থির থাকে

তবুও সে লভ্যকে পায়। একবার যে মন দিয়ে সেবা করে, দেবতা প্রসন্ন হ'য়ে তা'কে সেবার ফল দিয়ে থাকেন।'

'মণ্ডপ-গমন-খণ্ডে'র তৃতীয় স্তবকে জায়সী বর্ণনা: তিনি বসলেন ব্যাঘ্র চর্মের উপর তাপসের মতো। জপ ক'রলেন 'পদ্মাবতী পদ্মাবতী' নাম। সমাধিতে তাঁর দৃষ্টি পতিত হ'ল তার উপর যার দর্শণের কারণে তিনি বৈরাগী হ'য়েছেন। বিহ্বল অবস্থায় তিনি কিঙ্গরি বাজালেন, সকাল সন্ধ্যায় অনুক্ষণ শৃঙ্গা ফুৎকার দিলেন। অগ্নিদাহনে যেন তার কন্থা জীর্ণ হ'ল; বিরহ-বেদনার অগ্নি কখনও নির্বাপিত হয় না। সমস্ত নিশি পথ লক্ষ্য ক'রে তার নয়ন রক্তবর্ণ হ'ল যেন শশীর কামনায় চকোরের নয়ন। কুণ্ডল ধারণ ক'রে রাজা ভূমিতে মাথা রাখলেন। বললেন,

"যেখানে পদ্মাবতীর পা' পড়বে সেখানে আমি পাদুকা হব। আমি আমার জটা খুলে তার দ্বারপথ পরিস্কার করব এবং যে পথ দিয়ে সে আসবে সে পথে আমার মস্তক উৎসর্গ করব। আমি চতুর্দিক বৃত্তাকারে ঘুরব এবং এক মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকব না। যেখানে সে আছে যে আমার জীবনের আধার সেখানে আমি উড়ে যাব ভস্ম হয়ে।"

কিছুটা ভাব সংক্ষেপ করে আলাওল এর অনুবাদ করেছেন এভাবে:

এ বলিয়া শঙ্খ শিঙ্গা ঘন পুরে সান।
ঘোর শব্দ ঝঙ্কারিল দেবতায় স্থান॥
যার যেই যোগ্য স্থানে আলাপ করিয়া।
বসিলেক যোগী সবে আসন করিয়া॥
ধীরাসনে বসিল পাতিয়া মৃগ ছালা।
পদ্মাবতী নামেতে ফিরাএ জপমালা॥
সমাধি হইয়া মন সেই পদ্মা লাগি।
যার দরশন হেতু হইলু বৈরাগী॥
কিঙ্গরি লইয়া দুলে বৈরাগ রাজা এ।
শঙ্খ শিঙ্গা দুই সন্ধ্যা নিত্য ঝঙ্কার এ॥
নিশি জাগরণে আঁখি রাতুল কোটির।
সুধাকর ভাবে যেন চকিত চকোর॥

॥ ২ ॥

জায়সীর পদ্মাবতী-বিয়োগ-খণ্ডের[৪] সম্পূর্ণ অনুবাদ আলাওল করেন নি। মূলে পদ্মাবতী-বিরহ-খণ্ডে সখীগণের হৃদয়-বেদনা জড়িত যে সংলাপ, অনুবাদে তা কৃত্রিম বর্ণনায় পরিণত হয়েছে। যুবতী রমনীর প্রেমাকুলতার উৎসাহ আবেগ এবং দাহন জায়সী অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। যৌবন-হেতু পদ্মাবতীর দেহ এবং মনে প্রেমের যে উজ্জীবন এবং যার কারণে প্রতি মুহূর্ত তার কাছে কল্পসমান মনে হয় পদ্মাবতী তার ব্যাখ্যা করতে পারছে না। সে শুধু মাত্র দাহন অনুভব করছে, তার কোমল শরীরে প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়েছে তার নয়ন, দেহ হয়েছে বিকল কিন্তু বিরহ-ব্যাকুলতার কারণ নির্ণিত হচ্ছে না। যৌবন কালে বসন্ত যখন দেহকে উচ্ছলিত করে এবং প্রেমের কামনায় হৃদয়ে তাপ জাগে তখন জীবনকে পক্ষী স্বরূপ মনে হয় এবং বিরহকে মনে হয় ব্যাধের মত। যৌবনবতী রমণীর যে আকুলতা সর্ব অবয়বে এবং চিত্তে পরিব্যাপ্ত তার সে-চিত্র জায়সী এঁকেছেন, আলাওলের কাব্যে তা অনুস্থত হয়নি। আলাওল মূলের বিভিন্ন বিশেষণ এবং উপমাকে সর্বাংশে গ্রাহ্য করেন নি। তিনি প্রধানতঃ কাহিনীর গতি নির্মাণে ব্যাস্ত ছিলেন। তাই শ্রীপঞ্চমীতে মন্দির অঙ্গনে পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনের সাক্ষাৎকারকে সুসহ এবং দ্রুত করবার জন্য যৌক্তিক বিন্যাসে কয়েকটি ঘটনা উপস্থিত করেছেন। তাই তার কাব্যে পদ্মাবতীর যৌবন চাঞ্চল্য এবং চিত্তদাহের বিস্তৃত বিবরণ নেই। তিনি সংক্ষেপে পদ্মাবতীর চিত্ত চাঞ্চল্যের সংবাদ দিয়েছেন এবং শ্রীপঞ্চমীতে মন্দিরে যাবার প্রস্তুতির কথা বলেছেন। ঘটনার এ-পর্যায়কে বিলম্বিত না করে তিনি হিরামণিকে তার সন্নিধ্যে উপস্থিত করেছেন।

অবান্তর হলেও এখানে বিদেশী একজন কবির অনুবাদ কৌশলের কথা উপস্থিত করা যায়। ইংরেজী কবি চসার ইটালীর কবি বোকাচিওর Filostrato কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন। Trailus and Criseyde নামে। চসার মূল কাহিনীতে অনেক আবেগ সংযোগ করেছিলেন। তার রীতি ছিল আলাওলের বিপরীত। বোকাচিওতে যেখানে শুধুমাত্র ঘটনার বর্ণনাবৃত্তি আছে চসার সেখানে অতিরিক্ত আবেগ এবং রহস্য সংযুক্ত করে-

ছিলেন।[৪] আমাদের আলোচ্য দুজন কবির মধ্যে জায়সীর কাব্যে যেখানে প্রেমের রস-নিবেদনের বিস্তার আছে এবং উৎফুল্ল আবেগের চমকপ্রদ বর্ণনা আছে, আলাওলের কাব্যে সেখানে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্যের উদবৃত্তি আছে।

আলাওল জায়সীর পদ্মাবতী বিয়োগ খণ্ডের যে কয়টি স্তবকের ভাব সংক্ষেপ করে শুধু মাত্র মূল ঘটনার বর্ণনাবৃত্তিকে বিশিষ্ট রেখেছেন তার অনুবাদ এখানে উপস্থিত করছি :

১॥ "তার যোগ সাধনায় পদ্মাবতীর সংযোগ ঘটলো অর্থাৎ রাজা রত্নসেনের যোগপ্রভাবে পদ্মাবতীর চিত্তে প্রেম উৎপন্ন হল। প্রেমের বশীভূত হয়ে হৃদয় বিয়োগ ব্যাথায় আক্রান্ত হল। রাত্রি যখন এলো, নিদ্রা এলোনা নয়নে, যেন কেবাঁচ নামক এক প্রকার লতা-ফল কেউ শয্যায় বিছিয়ে রেখেছে যার ফলে শয়নে স্বস্তি ছিলোনা। চন্দ্র এবং চন্দন সুবাসিত বস্ত্র তার দেহকে দগ্ধ করেছে, গভীর বিরহ তার তনুকে ভস্ম করেছে। কল্পসম হ'ল তার রাত্রি, তিল তিল যে রাত তা হল যুগযুগান্তরের মত দীর্ঘকঠিন। কদাচিত রাত্রিকাল যদি কাটে, এ-ভেবে সে বীণা হাতে নিল, বীণাধ্বনি শুনে শশি-বাহন হরিণ অবনম্য হয়ে স্থির রইলো। তখন ধন্যা পদ্মাবতী সিংহমূর্তি[৬] আঁকলো এবং এভাবে সমস্ত রাত সে কাটালো চিত্তদাহে। বিলাপ করে বললো, কোথায় কমলরসগ্রাহী ভ্রমর? কেন সে পারাবত হয়ে অসছেনা? ধন্যা পদ্মাবতী বিরহ-পতঙ্গ হল, আকাঙ্ক্ষা করলো বিরহ প্রদীপে দগ্ধ হবার। ভৃঙ্গরূপে কান্ত আসছেনা, এখন কি হবে দেহে চন্দন প্রলেপ দিয়ে?

২॥ পদ্মাবতীকে আচ্ছন্ন করলো যেন বিরহাবন, দৃষ্টিতে যা অগম্য এবং অতি নিবিড়। চতুর্দিক এত নিবিড় যে পথভ্রান্তি ঘটে। সে কোন্ বন যেখানে মালতী ফুল প্রস্ফুটিত হয়? যে বনে কমল আছে, ভ্রমর সে বন সহজেই পায়, কিন্তু তনুর দাহ নির্বাপিত করবার জন্য কান্তকে কে এনে দেবে? কমল শরীর অগ্নি-তাপিত হয়েছে, প্রেম পীড়ায় হৃদয় পীতবর্ণ হয়েছে। রবিকে বিকশিত হতে দেখে পদ্মাবতী কান্ত দর্শন কামনা করলো।

ভ্রমর অর্থাৎ পদ্মাবতীর দৃষ্টিতে কমল বা কান্ত আকাশে জেগেছে। ধাই জিজ্ঞেস করলো, হে কন্যা বল, কমল কলির মত রক্তিম তোমার দেহবর্ণ কেন তা কৈশরের মত পীতবর্ণ হল? মনে হয় তোমার চিত্তে কোন সংশয় জেগেছে।

যেখানে বাতাস সঞ্চরণ করে না, সেখানে ভ্রমর বসে না। বিভ্রান্ত কুরঙ্গিনীর মত তুমি সন্ত্রস্ত, মনে হয় তুমি সিংহকে দেখেছ।

৩॥ হে ধাত্রী সিংহ যদি আমাকে হত্যা করে আহার করত তাহলে ভালো হত অর্থাৎ মুক্তি পেতাম, তেমনি শৈশব যদি কখনও অতিক্রম না করতাম তা হলেও কল্যাণ হত। শুনেছি যৌবন হচ্ছে নবীন বসন্ত ঋতু। যে বসন্ত-ঋতু সদৃশ বনে মদমত্ত হস্তী অর্থাৎ বিরহ প্রবেশ করেছে। এখন যৌবন-উদ্যানকে কে রক্ষা করবে? বিরহ-রূপী হস্তী যৌবন-রূপী উদ্যানের শাখা বিধ্বস্ত করছে। আমি জানি যে যৌবন হচ্ছে রস-ভোগের সময়, কিন্তু এখন বুঝেছি যে বিরহ-বিয়োগে যৌবন হচ্ছে কঠিন সন্তাপ। যৌবন হচ্ছে অটল পাহাড়ের মতো, যৌবনের ভার অসহনীয়। যৌবনের মতো মদমত্ত আর কিছু নেই। এ-মদমত্ত হস্তী একমাত্র প্রেমরূপ অঙ্কুশ-আঘাতে মাথা নোয়ায়। যৌবন যেন ভাদ্র মাসের পূর্ণ গঙ্গা, দেহ-তরঙ্গকে সংবরণ করা যায় না। হে ধাত্রী আমি অথৈ যৌবন-সমুদ্রে পতিত হয়েছি। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করছি যদি কেউ আমাকে তটপ্রান্তে নিয়ে আসে।

৪॥ হে পদ্মাবতী তুমি সমুদ্র সদৃশ যৌবনবতী।[৭] সমুদ্রও তোমার মতো পরিপূর্ণ নয়। নদী সমুদ্রে মিলিত হয় কিন্তু বলতো সমুদ্র কোথায় মিলিত হবে? এখন তোমার হৃদয় কমল-কলি সদৃশ, যখন তুমি মুকুলিত হবে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্য ভ্রমর আসবে। যৌবন তরঙ্গে বল্গা ধারণ করে, যেখানে সে যেতে চায় যেতে দিয়োনা। যৌবন হচ্ছে বলবান মত্ত হস্তী, একমাত্র জ্ঞানঅঙ্কুশের আঘাতে সে অচল হয়। হে বালিকা, এখনও প্রেমের খেলায় তুমি রত হওনি। সে খেলায় যে দুঃখ কত তা এখন তুমি কি করে বুঝবে? আকাশে যে দৃষ্টি তোমার রয়েছে তা নত কর। সূর্যের দিকে নয়নপাত করলে কি হবে সে কখনও হাতে আসবে না। যতক্ষণ

পর্যন্ত কান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমের পীড়া সহ্য কর, যেমন সমুদ্রের মধ্যে শুক্তি স্বাতীর একবিন্দু জলের জন্য তাপ করে।

৫॥ হে ধাত্রী অগ্নিতে ঘৃতের মত যৌবন আমার জীবনকে দগ্ধ করছে। করপত্রের আঘাতে দেহ বিখণ্ডিত হলে তাও আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু যৌবনের জ্বালা অসহ্য। বিরহ-সমুদ্র পরিপূর্ণ এবং অসংবৃত তার আবর্তের মধ্যে পতিত হয়ে জীবন নিঃশেষ হয়। বিরহ সর্প হয়ে শিরো-দেশে আরোহণ করে সে অগ্নি হয়ে চন্দনের মধ্যে বসতি করে। যৌবন হল পক্ষী এবং বিরহ তার ব্যাধ। যে প্রকারে সিংহ হরিণীকে আহার করে, সে প্রকারে বিরহ আহার করে নবযৌবনকে। বিধাতা যৌবনকে কেন সোনার তরল পানির মত করেছে যাকে অনবরত বিরহ-রূপ কঠিন আঁচে সিদ্ধ করতে হয়। যৌবন রূপ পানিতে বিরহের কালিমা মিশেছে যেমন ফুলকে বিশৃঙ্খল করেছে ভ্রমর এবং ফলকে তেতো। যৌবন চাঁদের মতো উদিত হয়েছে এবং বিরহ তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে রাহুর মতো। এ-ভাবে ক্রমান্বয়ে যৌবন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। এ অবস্থাকে কেউ বর্ণনা করতে পারে না।"

জায়সী তার বর্ণনায় যৌবনবতী রমণীর প্রণয়ের আশ্লেষ, উৎসাহ, দাহন এবং বিহ্বলতার যে চিত্র এঁকেছেন তার সম্পর্ক শুধুমাত্র একাগ্র প্রণয়বোধের সঙ্গে। এখানে প্রেমটি দেহ ও মনের সম্পূর্ণ অনুভূতি এবং যার অতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব তার নেই। যৌবন যখন সমুদ্র তরঙ্গের মত সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হয় তখন একটি মহত্তম সংযোগের অভিলাষ তার জাগে। এখানে ন্যায় অন্যায় পাপ বোধের প্রশ্ন উঠে না, প্রশ্ন উঠে শুধু প্রণয়াকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির এবং সংযোগ-সাধনার সিদ্ধির। তাই জায়সীর প্রধান সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যেমন ফুল-কলি বিকশিত হলে ভ্রমর তার সঙ্গে মিলিত হয় তেমনি শৈশব থেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশ পেয়ে রমণী যখন যৌবনবতী হয় এবং বিরহ তাপে দগ্ধ হয় তখন কান্তের সঙ্গে মিলনেই তার একমাত্র শোভা।

আলাওলের কাব্যে জায়সীর এ প্রণয়-দর্শন স্বীকৃতি পায়নি। তিনি প্রণয়ের উন্মাদনাকে সম্বরণ করতে বলছেন এ কারণে যে, প্রণয়লিপ্সার চেয়ে

অধিকতর সত্য হচ্ছে "জাতি কুল মান।" এর ফলে প্রেমের পরিচয়টি সমাজ-নির্ভর হয়ে পড়েছে। তা'ছাড়া আর একটি প্রধান পার্থক্য হচ্ছে—জায়সী যেখানে বলেছেন যে রাজার যোগ অবলম্বনের কারণে এবং একাগ্র কামনা বশতঃ পদ্মাবতীর হৃদয়েও আগ্রহ জেগেছে প্রেম-সংযোগের, আলাওল সেখানে বলছেন যে নব-যৌবনের কারণেই পদ্মাবতীর চিত্ত 'মদন-বশ' হয়েছে এবং সে বিবাহ কামনা করছে। আলাওল সর্বমুহূর্তে সংসার ও সমাজের স্মৃতি, কর্তব্য এবং সফলতার কথা চিন্তা করেছেন তাই তাঁর পরিকল্পনায় প্রেম হচ্ছে সংসার জীবনে ফললাভের একটি মনস্কামনা। জায়সীর কল্পনায় প্রেম হচ্ছে সংসার সমাজ, এমন কি আত্মসত্তার উর্ধে চিরকালের বিরহ-ব্যাকুল চিত্তে প্রেরণাস্বরূপ। উদ্দাম প্রেম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। তাই আলাওল বলছেন যে 'ধর্ম-নাম' রক্ষার জন্য বিরহ-দুঃখ সহ্য করা প্রত্যেক যৌবনবতী রমণীর কর্তব্য এবং কামে বশীভূত হ'লে সত্য ও দেবতার কথা সকলে বিস্মৃত হয় যেমন হ'য়েছিল গুরুপত্নী তারা।

জায়সী বলছেন, 'যোগী যতি যেমন পবন বন্ধন করে ঃ কামকে তেমনি বন্ধন করে সতী কামিনী। বসন্ত এসেছে বিচিত্র পত্রপুষ্প নিয়ে রমণীরা যাচ্ছে দেব-দ্বারে পূজার জন্য। তুমি বসন্তের পুষ্পসম্ভার নিয়ে মহাদেবকে পূজা করলে তোমার কাম্য প্রিয়তমকে পাবে। এ-অংশের ভাষান্তর তথা রূপান্তর আলাওলে নিম্নরূপ—

"শ্রীপঞ্চমীত যাই মানা ও মহাদেব।
পতিবর পাইবা করিলে দেব সেব॥
যেই কামে গুরুপত্নী হরিছিলা চন্দ্রে।
রাখিতে নারিল সত্য ব্রহ্মা আদি ইন্দ্রে॥
তিলে না চাহিল মহাযোগী পশুপতি।
কুলের মহত্ব রাখে ধন্য কুলবতী॥

'পদ্মাবতী বিয়োগ-খণ্ডে' জায়সীর কাব্যে পদ্মাবতীকে প্রবোধ দিচ্ছে তার ধাত্রী, আলাওলের কাব্যে প্রবোধদাতৃ হচ্ছে সখী।

॥ ৩ ॥

বিয়োগ-অধ্যায়ের পর হিরামনীর সঙ্গে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হ'ল।[৮] শুককে দেখে পদ্মাবতীর উল্লাস হল এবং পদ্মাবতী এতদিনকার অদর্শনের সমস্ত ইতিহাস তাকে ব্যক্ত করতে বলল। শুক তখন সিংহল দ্বীপ ত্যাগ করার সময় থেকে রত্নসেনের সাহচর্য পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল এবং অবশেষে বলল যে রাজা রত্নসেন পদ্মাবতী লাভের আশায় যোগ অবলম্বন করে মহাদেব মন্দিরে অপেক্ষা করছেন। এ সংবাদ শুনে পদ্মাবতীর হৃদয়ে রাজার প্রতি অনুরাগ জাগল এবং রাজাকে দেখবার আগ্রহে বসন্ত পঞ্চমীতে মহাদেব মন্দিরে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। পদ্মাবতীর আগ্রহের সংবাদ নিয়ে শুক ফিরে গেল রত্নসেনের কাছে। ঘটনার এ অনুক্রম আলাওল সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন, কিন্তু বর্ণানার ভাষা আলাওলের নিজস্ব। শুক যেখানে তার পূর্বকাহিনী বর্ণনা করেছে মূলে সে অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু আলাওল পয়ার-ত্রিপদীতে মধ্যযুগের বাংলা ছন্দের রূপকল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজের মত করে সে অংশ বর্ণনা করেছেন। এ-বর্ণনায় একটি সত্য স্পষ্ট হয় যে আলাওল কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় যতটা আগ্রহী ছিলেন, চিত্তের রসাবেশ, উৎসাহ এবং আবেগ বর্ণনায় ততটা ছিলেন না। যেখানেই তিনি ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেখানে তার ভাষা স্বচ্ছ হয়েছে, অনুপ্রাস ও ছন্দ বক্তব্যে একটি দ্রুত গতি এনেছে। কিন্তু যখন তিনি কোন তত্ত্ব বা রহস্য বর্ণনা করেছেন তখন তা অহেতু সংযোজনের মত দ্বিধাগ্রস্থ ও মন্থর হয়েছে।

শুকের বক্তব্য বর্ণনা শেষে আলাওল বলছেন :

"ভাঙ্গিয়া চৌপাই ছন্দ রচিল পয়ার বন্ধ
পদে পদে অমৃত ভারতি।"

এর পরবর্তী কথাগুলি আলাওলের নিজস্ব ব্যতিক্রম সহ মূলের অনুক্রম। মূলে পদ্মাবতী-শুক-ভেটখণ্ডের চতুর্থ স্তবকে জায়সী বর্ণনা করছেন :

"যখন রাজা আমার মুখে তোমার রূপবর্ণনা শুনলেন তার হৃদয়ে তখন বিরহ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। মনে হল যেন একটি অমূল্য রত্ন স্বর্ণের

কলিকা[৯] পেয়েছে। [এখানে রত্ন হল রত্নসেন এবং স্বর্ণ কলিকা হল পদ্মাবতী।] প্রেম কঠিন এবং বিরহ বেদনা অধিকতর দুঃখজনক। রাজা রত্নসেন রাজ্য ছেড়ে যোগী এবং ভিখারী হয়ে বনে গমন করলেন। যে প্রকারে মালতীপুষ্প ভ্রমরের জন্য উন্মাদ হয় সে প্রকারে রাজা জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে পথে বেরিয়ে এলেন। বলতে লাগলেন, আমাকে পতঙ্গ হতে দাও, আমি পদ্মাবতীকে পাবার জন্য সিংহলদ্বীপে[১০] যাব এবং প্রাণকে বলিদান করব। তার সঙ্গী সাথী তাকে নিঃসঙ্গ থাকতে দিল না। ষোল সহস্র রাজকুমার তার সঙ্গে বনে গমন করল। আরো অনেক সহায়ক তার হল যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না। তিনি মহাদেব মন্দিরে এলেন। সূর্যরূপী এ-পুরুষ তোমার দর্শনের জন্য সেখানে প্রতীক্ষা করছে যেমন চকোর চাঁদের জন্য করে। কমল-সম সুগন্ধবতী তুমি, তোমার রসভোগের যোগ্য ভ্রমরকে আমি সূর্যকে প্রকাশিত করে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য এনেছি।"

আলাওলে এ অংশের রূপান্তর নিম্নরূপ—

পুনি শুকে কহে "শুন রাণী পদ্মাবতী।
যেন রূপ গুণ তুমি তেহেন নৃপতি॥
শুনিয়া তোমার রূপ হইয়া পাগল।
প্রাণ উপেক্ষিয়া আইল নগর সিংহল॥
একেশ্বর না পারিল হইতে বিয়োগী।
ষোলশত কুমার সঙ্গেত হৈল যোগী॥
তোমার প্রেমের ভাবে তেজি অন্নপানি।
তৃণবৎ না শুনিয়া হেন রাজধানী॥
হেন ভাবকের দয়া না করহ যবে।
তিলে মাত্র জীবন তেজিব যুগী সবে॥
তোমার উপরে পুনি হৈব মহাবধ।
চতুর হইয়া পাছে হইবা মগধ॥
এহার অধিক আমি কহিতে না জানি।
আজ্ঞা দেও যাই আমি যথা নৃপমণি॥"

দেখা যাচ্ছে মূলের রহস্য অনুবাদে বর্তমান নেই। মূলে প্রেমাকুলতার তাৎপর্যপূর্ণ যে সমস্ত ইঙ্গিত আছে অনুবাদে তা উপেক্ষিত হয়েছে। আলাওল

সংসারের কোলাহলের মধ্যে একজন সাংসারিক প্রাণীর "অন্নপানী" ত্যাগের কথা বলছেন। আলাওলের বর্ণনাটি সম্পূর্ণ রূপে একটি সংবাদ। হীরামণি শুক বলছে রাজা রত্নসেন পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে প্রাণ উপেক্ষা করে অন্নপানী ত্যাগ করে সিংহল নগরে এসেছে। তাকে যদি এখন পদ্মাবতী দয়া না দেখায় তাহলে তার মৃত্যু ঘটবে। আলাওল এ সংবাদটাই অত্যন্ত সরল ভাবে বর্ণনা করেছেন; কোনরূপ অলঙ্কৃত করবার চেষ্টা করেননি।

এর পরে হীরামনির উক্তি শুনে পদ্মাবতীর মনোভাব জায়সী নিম্নরূপে ব্যক্ত করছেন:

"হীরামনির কথা শুনে পদ্মাবতী রত্নসেনের অনুরক্ত হল। যে ভাবে সূর্য প্রকাশমান হলে তার দীপ্তির প্রভাব পড়ে সে ভাবে পদ্মাবতীর হৃদয়ে রত্নসেনের বর্ণনা বিরহ জাগ্রত করল এবং তার বাসনাকে কুপিত করল। কিন্তু যোগীর বর্ণনা শুনেও পদ্মাবতীর মনে অভিমান জাগল। স্বর্ণের কলিকা কখনও কাঁচের জন্য লোভ করে না। তার শোভা তখনই হয় যখন সে মুক্তাকে পায়। স্বর্ণকে যদি কষ্টি পাথরে ঘষা যায় তবেই জানা যায় তার বর্ণ পীত না লাল। অমূল্য রত্নের মর্ম সেই জানে যে রত্নকে স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত করবার কৌশল অবগত আছে। সে রত্ন দেখে বলতে পারে যে তা অলঙ্কারে বসবার উপযুক্ত কিনা। এখন কে সিংহের মুখের মধ্যে হাত রাখবে অর্থাৎ আমার পিতার কাছে এ সংবাদ কে বলবে। স্বর্গের ইন্দ্র এবং পাতালের বাসুকী আমার পিতার সম্মুখে ভয়ে ভীত। সমগ্র পৃথিবীতে আমার যোগ্য কে আছে?"

আমরা এখানে দেখছি যে পদ্মাবতী সহজেই রত্নসেনকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। সে পরীক্ষা করতে চাচ্ছে যে যথার্থই রত্নসেন প্রেমাকুলতায় জর্জরিত কি না। রত্নসেন যে যোগ অবলম্বন করেছে সে যোগ কপট না সত্য তা না জেনে রত্নসেনকে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সোনার অলঙ্কারে কাঁচখণ্ড বসবে এ সে চায় না। সোনার অলঙ্কারে বহুমূল্য রত্নই স্থান পাবে, অর্থাৎ পদ্মাবতী রূপ স্বর্ণ কলিকায় সত্য যোগসিদ্ধ রত্নসেন রূপী রত্ন শোভা পাবে।

আলাওল প্রেম তত্ত্বের এ রহস্যকে গ্রহণ করেননি। তিনি বাঙ্গালী সমাজের প্রচলিত জ্ঞান ও বিবেচনার কথা উপস্থিত করেছেন। আলাওলের কাব্যে শুকের কথা শুনে পদ্মাবতী বলছে, "তুমি জ্ঞানী সুতরাং তুমি আমার অকল্যাণ নিশ্চয়ই কামনা কর না। সকল দিক বিবেচনা করেই তুমি আমার যোগ্য বর নিয়ে এসেছ। কিন্তু একজন যোগীকে আমার পিতা তো কখনও জামাতা রূপে বরণ করবেন না। তাহলে এ সংবাদটা আমার পিতৃগোচর কে করবে?" মূলের যোগতত্ত্ব এবং নৃপতির প্রণয় সাধনার যে কথা আছে আলাওলের কাব্যে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

পিতার কাছে কি করে সংবাদ যাবে এ প্রশ্ন যখন পদ্মাবতী করল তখন আলাওল বলছেন যে যাকে মানুষ কামনা করে তাকে সে পায়। সময় এলে রত্নসেন নিজেকে প্রকাশ করবেন। তাছাড়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনায় দেখা গিয়েছে যে রত্নসেনের সঙ্গে পদ্মাবতীর মিলন অবশ্যই ঘটবে। সুতরাং কোন প্রকার ভয়ের কারণ নেই।

আলাওলের এই বক্তব্য সমাজ ও সংসারের সিদ্ধান্ত-জড়িত একটি চিরা-চরিত প্রথাগত উক্তি। জায়সীর কাব্যে এখানে প্রেমাকুলতার একটি উল্লাস আছে। জায়সী বলছেন যে, যোগ নির্বাহে রাজার অপার দুঃখের তুলনা হয় না। প্রেমের অগ্নি-দাহনে তিনি জর্জরিত। বিরহের অগ্নি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সে অগ্নিদাহন যে সহ্য করে সে একাকীই সহ্য করে। সিদ্ধিলাভ যেদিন হবে সেদিনই রাজা দুঃখের অগ্নি থেকে বাইরে আসবেন।

এরপর জায়সী বলছেন,

"শুকের উক্তি শুনে রাজ-কন্যার মনে কৌতূহল জাগল এবং এ বাসনা জাগ্রত হল যে রত্নসেন রূপী সূর্য কিভাবে জ্বলছে তা আমি দেখতে চাই। স্বর্ণ যদি অগ্নিতে তপ্ত হয় তবে তার কান্তি অধিক বৃদ্ধি পায়। প্রেমের বিয়োগে রত্নসেনের যদি মৃত্যু হয় তবে তা আমার জন্য হবে কেননা সে আমার জন্য যোগ ধারণ করছে। রত্নসেনের বর্ণনা শুনে পদ্মাবতী অনুরক্ত হল এবং বলল, যদি মৃগচর্ম আসীন হয়ে সে যোগকে সম্বরণ করতে পারে অর্থাৎ কোন প্রকার অচেতন না হয় তবে আমি তাকে জয়মাল্য দেব।

বসন্তের আগমন পর্যন্ত যদি তার কুশল সংবাদ পাই তবে পূজার ছলে আমি মহাদেব মন্দিরে যাব। তোমার কথায় আমি তার জন্য পুষ্পমাল্য গেঁথেছি। আমি নয়ন ভরে তাকে দেখব এবং তাকে জয়মাল্য দেব। কমলের প্রত্যাশী যে ভ্রমরের বর্ণনা তুমি করেছ তাকে আমি স্বীকার করেছি। যদি সে বাস্তবিক সূর্য হয় তবে সূর্যের জন্য চন্দ্রেরও আবশ্যকতা আছে।

আলাওল এর পরিবর্তে লিখেছেন ঃ

শুকের বচনে কন্যা হৈল কুতূহল।
মহাবৃষ্টি জলে যেন নিবায় অনল॥
শুক সঙ্গে নিবারিল নির্ব্বন্ধ কথন।
শ্রীপঞ্চমী পূজা হৈলে হৈব দরশন॥
বিদায় মাগিতে শুকে কন্যা কহে কথা।
"যেজন পরের হয় না রহএ এথা॥
বিচারি চাহিলুঁ যার অঙ্গে আছে পাখা।
আজ যদি রাখি কালি না যাইব রাখা॥"

এর পরবর্তী বর্ণনা জায়সীতে নিম্নরূপ ঃ

"হীরামণি যখন এ প্রকার রসপূর্ণ বাক্য শুনল তখন তার ঠোঁট লাল হল। শুক যখন চলতে লাগল তখন রাণী বলল, যে অপরের হয়েছে সে কি করে আমার থাকবে? যে সর্বদা উড়বার জন্য আপনার পাখাকে সঞ্চালন করে সে যদি একদিন এখানে অধিষ্ঠান করে তবে কাল অন্যত্র চলে যাবে। জানিনা, আজ তার উদয় কোথায় হবে। শুক আমার সঙ্গে মিলতে এসেছিল, মিলনের পর চলে গেছে। মিলনের পর পৃথক হওয়া মরণের সমতূল্য। যদি অন্তে চলে যেতেই হবে তবে সে এল কেন? শুক বলল, আমি অবশ্যই তোমার কাছে থাকতাম, কিন্তু আমি অন্যত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এখন কি প্রকারে আমি আর অপেক্ষা করি? তার দৃষ্টি তোমার উপরই নিবদ্ধ। যেমন নিকুঞ্জে কোন পক্ষী স্বাভাবিক ভাবে থাকে, অর্থাৎ নিকুঞ্জে একটি পক্ষীর আবাস যেমন স্বাভাবিক, পদ্মাবতীর সঙ্গও তেমনি হীরামণি শুকের জন্য স্বাভাবিক। ধরিত্রী বক্ষে জলের মধ্যে মাছ থাকে এবং আম্রফল বৃক্ষের শাখায় আকাশে।

যদি উভয়ের মধ্যে প্রেম থাকে তবে অন্তে উভয়ের মিলন ঘটবে। এ অংশটুকু আলাওলে নিম্নরূপে রূপান্তরিত হয়েছে ঃ

কোথা হন্তে আসিয়া সন্তোষ কৈলা শুক।
পুনি চলি যাও মোর বিদরিয়া বুক॥
তোমার বিচ্ছেদ পুনি মরণ সমান।
আসিয়া কি ফল যদি না রহে নিদান॥
শুকে বলে "স্মরি আমি তোমার লবণ।
তোমা স্নেহ ছাড়িতে না পারি কদাচন॥
কিন্তু বন্দী হৈছি সত্যে নৃপতির হাতে।
তে কারণে যাইতে চাহি নৃপতি সাক্ষাতে॥
নৃপতিরে তোমারে না জানি ভিন্ন ভেদ।
ভিন্ন স্থানে না যাইমু না করিও খেদ॥
চিত্তের নয়ানে তোমা ভাবি অনুক্ষণ।
যেন ক্রৌঞ্চ কূর্ম্ম ভৃঙ্গ ডিম্বগত মন॥"

আলাওলের কাব্যে শুক যে একসময় পদ্মাবতীর লবণ গ্রহন করেছিল অর্থাৎ পদ্মাবতীর গৃহে লালিত হয়েছিল একথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে কারণে বক্তব্যটি শুধুমাত্র সমাজ ঘটিত কিন্তু কাব্যভাবপুষ্ট নয়।

তা ছাড়াও মূল বর্ণনার রহস্যঘন তাৎপর্য বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হ'য়েছে।

সর্বশেষ স্তবকে জায়সী বলছেন, যেখানে রত্নসেন বসেছিলেন সেখানে শুক এল। সে বিয়োগে ব্যথিত ছিল এবং তার নেত্র প্রতিক্ষারত ছিল। শুক তাকে প্রেম এবং রসপূর্ণ সংবাদ শোনাল, যেন গুরু গোরক্ষনাথের উপদেশ এল। শুক বলল, তোমার উপর গুরু কৃপা করেছেন, তোমাকে আদেশ দিয়েছেন এবং প্রেমের মূল মন্ত্র জানিয়েছেন। সে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছে যে, শুক হল ভৃঙ্গপক্ষী এবং শিষ্য হল পতঙ্গ। ভৃঙ্গপক্ষী পতঙ্গকে ধরে এবং একবার তার প্রাণহরণ করে তাকে নতুন প্রাণ দেয়। শিষ্যের উপর গুরু এরকমই কৃপা করেন। গুরু শিষ্যকে নবীন জন্ম দেন

এবং নবীন শরীর প্রদান করেন। যে মরে আবার জীবিত হয় সে অমর হয় এবং সে ভ্রমররূপে কমলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মধু পান করে। যখন বসন্ত ঋতু আসবে, তখন মধুকর গুঞ্জরণ করবে এবং ফুলের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যদি যোগী যোগসাধন করে তবে সে সিদ্ধি পায়।

এ অংশে আলাওলের রূপান্তর অনেকটা মূলানুগ :

এতেক কহিয়া শুকে গেলা যথা যোগী।
পন্থ হেরি রহিয়াছে বিরহ-বিয়োগী॥
হরাষিতে আসি শুকে কহিল সন্দেশ।
যোগ সিদ্ধি বচন কহিল উপদেশ॥
তোমা প্রতি সুন্দরী বিস্তর মায়া কৈল।
উদ্দেশ শুনিয়া আদ্য আদেশ করিল।
এখানে তোমার গুরু মূল্য পদ্মাবতী।
এক চিত্তে ভাবিয়া কৃপাল হৈল অতি॥
গুরু ভৃঙ্গতুল্য শিষ্য পতঙ্গ সমান।
প্রথমে মারিয়া পুথি দেয় প্রাণ দান॥
তাহারে অমর বলি যেই মরি জিএ।
অলি পদ্ম মিলিয়া একত্রে মধু পিএ॥
সমুখে বসন্ত ঋতু হৈল উপস্থিত।
পূজা ছলে দরশন সিদ্ধি সমাহিত॥
শুনিয়া নৃপতি পুলকিত হৈল অঙ্গ।
আনন্দ সাগরে যেন উঠিল তরঙ্গ॥
এই মতে শুকে নিতি আইসে আর যায়।
আশ্বাস-বচন-রসে দোহাক শান্তায়॥

॥ ৪ ॥

এর পরের বর্ণনা বসন্তের শ্রীপঞ্চমীর।[১১] নওল ঋতু রাজা বসন্তের আগমনে উল্লসিত পদ্মাবতী চতুর্দিকে পত্র-পুষ্পের সম্ভারের মধ্য দিয়ে সখীদল সহ যাত্রা করল দেবপূজার জন্য মহাদেব মন্দিরের পথে। সংবাদ ছড়িয়ে

পড়লো চতুর্দিকে। কুমারীরা শৃঙ্গার সাজালো। কমল-কলী রূপী পদ্মাবতী বিকশিত হ'ল মালতী পুষ্পের মতো। দেহে সুগন্ধী লেপন করে তারা চললো। তারা চললো কৌতুক ক্রীড়া করতে করতে। এ ভাবে তারা উপ-নীত হ'ল মহাদেব-মন্দিরে। পদ্মাবতী মণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। পদ্মাবতী পূজার সামগ্রী একত্রিত ক'রে দেবতাকে প্রণাম করলো। বললো 'হে দেবতা আপনি গুণী এবং নির্গুণী সকলকেই দান করেন। তাই আমার আর্তি আমাকে যোগ্য বর দিন।' এমন সময় সখীগণ যোগী রত্নসেন ও তাঁর শিষ্যদের দেখ্‌লেন। পদ্মাবতী ও তার সহচরী কুমারীগণকে দেখে রত্নসেন ও শিষ্যগণ অচেতন হ'ল। পদ্মাবতী যোগীর বক্ষে চন্দন প্রলেপ দিয়ে লিখ্‌লো, 'তুমি ভিক্ষা পাবার যোগ্য তপস্যা করনি। যখন ভিক্ষা পাবার সময় এলো তখন তুমি নিদ্রাগত হ'লে, তা'হলে ভিক্ষা আর কি ক'রে পাবে? তুমি যদি সূর্য হও এবং অনুরক্ত হ'য়ে থাক চাঁদের প্রতি তা' হলে সপ্ত আকাশ পরিক্রম ক'রে তার সান্নিধ্যে যাবে।" পদ্মবতী প্রত্যাবর্তন করলো রাণী নিবাসে। রাত্রির নিদ্রার শেষে পরদিন প্রভাতে একজন সখীকে বললো; 'গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন চন্দ্র পূর্বের আকাশে জেগেছে এবং সূর্য পশ্চিমে। তারা দ্বৈত ছিলো ক্রমন্বয়ে একত্রিত হ'ল। মনে হ'ল দিন এবং রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।' স্বপ্নের ব্যাখা ক'রে সখী বল্‌লো, 'তুমি হ'লে চন্দ্র এবং সূর্য হ'ল পুরুষ। স্বপ্নে তোমাদের মিলনের নির্দেশ এসেছে।'

'বসন্ত খণ্ডে' আলাওল প্রধানতঃ মূলানুসারী। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাজসজ্জার বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত ক'রেছেন, কিন্তু শেষাংশের মূলানুসরণ ব্যতিক্রম বিহীন।

এর পরের বর্ণনা[১২] দুঃখে রত্নসেনের অগ্নিদাহনের প্রস্তুতির। নিদ্রার বিহ্বলতা থেকে জেগে রত্নসেন দেখলেন যে বসন্তও নেই, উদ্যানও নেই, ক্রীড়-কৌতুকরতা রমনীরাও সেই। হঠাৎ বক্ষে লিখিত চন্দন অক্ষরের দিকে দৃষ্টি পড়লো তখন তিনি হতাশায় মস্তকে করাঘাত ক'রে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, পদ্মাবতী তাঁর নয়ন নিমীলিত ক'রে আত্মগোপন ক'রেছে। দেবতার প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ হ'লেন। ভাবলেন যে দেবতা তার প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতকতা ক'রেছে। দেবতার উত্তর এলো, 'পদ্মাবতীর দেহ-কান্তি তোমাকে মাত্র নয়, সকল দেবতাকেই অচেতন করেছে।' রাজা সিদ্ধান্ত দিলেন যে তিনি চিতা সাজিয়ে অগ্নিদাহনে দেহত্যাগ করবেন, কেননা তিনি তাঁর কাম্য লাভ করেননি। এ-সংবাদ শুনে হনুমান পার্বতী ও মহেশের নিকট রত্নসেনকে সঙ্কট থেকে ত্রাণ করবার জন্য আবেদন জানালো।

এ-অধ্যায়ে আলাওলের তিনটি সংযোজন আছে। প্রথম সংযোজনটি দেশজ কয়েকটি উপমার। 'জল-বিহীন মৎস্য যেমন অস্থির হয় তেমনি রত্নসেন অস্থির হ'লেন,' মূলের এ-উপামার সঙ্গে তিনি সংযোজন করলেন—

"কাঁচা কাষ্ঠে এক দিকে লাগিলে আনল।
আর দিক হৈতে যেন নিঃসরয় জল॥
নব মন বসন্তে বরিখে জলধার।
খঞ্জন উগরে যেন গজমতি হার॥

দ্বিতীয় সংযোজনটি একটি সংস্কৃত তত্ত্ববাক্যের ব্যাখ্যা

"মুর্খ সকলের দেব প্রতিমা সে সার।
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার॥
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন।
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন॥"

তৃতীয় সংযোজনটি 'কাকুনুছ' পক্ষীর বর্ণনা। মূলে শুধু আছে 'যেমন' ক'রে 'ককনু পক্ষী' আপনার চিতা সজ্জিত করে, রাজা তেমনি ক'রে তাঁর চিতা সাজালেন। আলাওল অতিরিক্ত ৩৪টি চরণ সংযোজন ক'রে 'কাকুনুছ' পক্ষীর একটি দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। এ-বর্ণনাটি তিনি পেয়েছেন ফরিদুদ্দীন আত্তারের রচনা থেকে—

"মোর বাক্য মনে যদি প্রত্যয় না ধরে।
মোহন্ত কুতবে দেখ কহিছে আত্তারে॥

বাঙলা একাডেমী ৪ | আ৪ | প৪ পুঁথিতে, 'মোহন্ত কুতবে'র পরিবর্তে 'মনতেক তায়েরে' কথাটি আছে। এ-পাঠটি শুদ্ধ বিবেচিত হ'লে বলতে হয় ফরিদুদ্দীন আত্তার রচিত 'মনতেকুত-তায়ের' নামক পক্ষী বিষয়ক গ্রন্থ থেকে তিনি বর্ণনাটি দিয়েছেন।

মূলে যেখানে আছে যে রাজার অগ্নিদাহনের প্রস্তুতি দেখে হনুমান পার্বতী এরং মহেশের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে দিল, আলাওল সেখানে বলছেন যে, চিতা সাজিয়ে রাজা রত্নসেন ভাবছেন যে মহাদেব যদি এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার না করেন তাহলে তিনি চিতার মধ্যে প্রবেশ করবেন।

॥ ৫ ॥

এর পরবর্তী অধ্যায় পার্বতী মহেশ বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ করে উপস্থিত হলেন। তিনি কুষ্ঠ রোগীর বেশ ধারণ করেছিলেন। তার শরীরে ছিল ছিন্ন কন্থা এবং অস্থিমালা ছিল তার জপমালা। মুণ্ডমালা তিনি ধারণ করে এসেছিলেন এবং স্কন্ধদেশে নিয়ে এসেছিলেন মৃত্যুকে। শেষ নাগ সর্প ছিল তার কণ্ঠদেশে, তার দেহ ছিল ভস্মচ্ছাদিত এবং দেহে ছিল হস্তীচর্ম,[১৪] বাহুতে ছিল রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে ছিল চন্দ্র এবং জটায় ছিল গঙ্গা। ঘণ্টা এবং ডমরু ছিল তার হাতে, গৌরী পার্বতী ছিল তার সঙ্গে, বীর হনুমানও তার সঙ্গে ছিল। হনুমান এসেছিলেন শিশু বানরের বেশে। মহাদেব এসে বললেন, তুমি তোমার শরীরে আগুন লাগিয়োনা, যার কারণে তুমি অগ্নিদগ্ধ হতে যাচ্ছ তোমাকে তার শপথ দিচ্ছি। তুমি কি তপস্যা করে পূর্ণতা পাওনি? না তুমি যোগ ভ্রষ্ট হয়েছ? কেন তুমি জীবন থাকতে জীবনকে নিঃশেষ করতে চাচ্ছ? তোমার বিয়োগ ব্যথার বিবরণ আমাকে দাও।

আলাওল তার অনুবাদে মূলের অল্প কিছু পরিবর্তন করেছেন। মহাদেবের সঙ্গে হনুমান এসেছিল এ সংবাদ আলাওল রাখেননি, তাছাড়া মহাদেবের সাজ সজ্জার মধ্যেও সামান্য কিছু ব্যতিক্রম এনেছেন। যেমন হস্তী চর্মের পরিবর্তে আলাওল ব্যাঘ্র চর্মের কথা বলেছেন। মূলে ত্রিশূলের কথা নেই, আলাওল মহাদেবের হাতে ত্রিশূল দিয়েছেন। কিন্তু এই অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ ভাবে এ স্তবকের অনুবাদ মূলানুগ?

দ্বিতীয় স্তবকটিও মূলের অনুগত। শুধু একটি পরিবর্তন আছে, জায়সী ভর্তৃহরির একটি উপমা দিয়েছিলেন—যেমন ভর্তৃহরি পিঙ্গলার জন্য

বিবাগী হয়েছিলেন, তেমনি আমি পদ্মাবতীর জন্য বিবাগী হয়েছি। আলাওলে ভর্তৃহরির এ উপমাটি নেই। তা ছাড়া মূলের দোহা অংশের অনুবাদ বাংলাতে করা হয়নি। দোহা অংশে আছে এ কথা বলার পর রাজার মুখ দিয়ে বিরহ অগ্নি নিঃসরিত হল যদি মহেশ সে অগ্নি নির্বাপিত না করতেন তবে তা সকল বিশ্বে পরিব্যপ্ত হত।

তৃতীয় স্তবকে বর্ণিত হয়েছে, পার্বতীর অনুকম্পা এবং অপ্সরারূপ ধারণ করে রাজার প্রেমের সত্যতা পরীক্ষা করার কৌশল। আলাওল এ স্তবকটি সম্পূর্ণরূপে মূলের সঙ্গে সঙ্গত রেখেছেন। দোহা অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি। সেখানে আছে, আমি কৈলাস নিবাসী অপ্সরা, আমার সমকক্ষ কেউ নেই। যদি আমাকে ছেড়ে তুমি—পদ্মাবতীর ধ্যান কর তাহলে তোমার কি লাভ?

চতুর্থ স্তবকে রত্নসেনের উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এখানে আলাওল মূলকে অনুসরণ করেন নি। এ স্তবকে মনুষ্যত্ব এবং দেহত্ব সংক্রান্ত একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা শেষে আলাওল বলছেন যে, দেবতা এবং মানুষ দুই বিরোধী অনুভূতির প্রতীক বলে দেবতা এবং মানুষের সমাগম অসম্ভব। মূলে এখানে আছে যে, রাজা রত্নসেন বলছেন যে তিনি অপ্সরার সঙ্গী হয়ে স্বর্গে যেয়ে কি করবেন? যার জন্য তিনি বিরহ ব্যথার চিতা শয্যা প্রস্তুত করেছেন সেই তো তার স্বর্গ।

পঞ্চম স্তবকে গৌরীর উক্তি বর্নিত হয়েছে। পরীক্ষিত রত্নসেনের সত্য দৃষ্টি দেখে গৌরী মহাদেবকে বলছেন যে তুমি হয় এর আশা পূর্ণ কর নয়তো এর হত্যার দায়িত্বভার তোমার উপর পড়বে। আলাওল মূলের ভাব সংক্ষেপ করেছেন। তিনি শুধু মহেশের প্রতি পার্বতীর অনুরোধের কথাটি রেখেছেন, কিন্তু রত্নসেনের যে বর্ণনা পার্বতী দিয়েছেন সে বর্ণনা তিনি রাখেন নি।

ষষ্ঠ স্তবকে রাজা রত্নসেন জানতে পারলেন যে বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে যে ব্যক্তি তার সম্মুখে উপস্থিত, তিনি সাক্ষাৎ মহাদেব। ভাব-সংক্ষেপ করলেও আলাওল এ স্তবকে সিদ্ধার রূপ বর্ণনাকে মূলের সঙ্গে সঙ্গত রেখেছেন।

সপ্তম স্তবকে নৃপতি মহাদেবের পদধারণ করে স্তুতি করছেন। এ স্তবকেও মূলানুসরণ যথার্থ। আলাওল শুধু বর্ণনার সংক্ষেপ করেছেন। মূলের অল্প কিছু পরিবর্তন আছে। যেমন রাজা রত্নসেন যে ক্রন্দন করছেন তার বর্ণনায় জায়সী বলছেন যে রত্নসেনের চক্ষু থেকে মুক্তা ঝরে পড়ছে, আলাওলে এ উপমাটি নেই। তাছাড়া শ্রাবণের মেঘের কথাটিও সুন্দর সংযোজন। মূলে শুধু মেঘের কথাই আছে।

অষ্টম সর্গে নৃপতির প্রতি মহাদেবের করুণা বর্ণিত হয়েছে। এ সর্গটি আলাওল সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন। শুধু দোহা অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে।

মূলের নবম এবং দশম স্তবক আলাওল অনুসরণ করেন নি। তার পরিবর্তে আলাওল সুফী এবং যোগীদের আত্মবিনাশের কথা এবং সর্বভূতে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করার কথা বলেছেন। আলাওলের নিজস্ব সংযোজনটি এই :

যাবতে না করে যোগী আপনা বিনাস।
তবে সে না পুরে কভু নিজ মন আশ॥
আপনা করিয়া নাশ ভাবহ যাহারে।
কার্য সিদ্ধি হবে মাত্র রাখহ তাহারে॥
প্রকটে কহিও কথা লোকাচার যত।
গোশত রাখিও মন যথা মনোরথ॥
সুই সুই করিতে হারএ সব কাজ।
আপ নাহি, সব আছে, শুন মহারাজ॥
জীবন থাকিতে যদি মরে একারে।
পুনি কোথা মরণ কে মরে কেবা মারে॥
আপনহি গুরু যোগী আপনহি চেলা।
আপনে সকল মাত্র, আপনে একেলা॥
যে চাহে করিতে পারে আপনে আপন।
আপনে মরণ সত্য আপনে জীবন॥
আপনা করিয়া নাশ আপে সর্বময়।
আপনে যাহাকে ভাবে সেই আপ হয়॥

॥ ৬ ॥

পরবর্তী অধ্যায় রত্নসেন কর্তৃক সিংহলের গড় বেষ্টন।[১৩] এ অধ্যায়ে প্রেম তত্ত্বের অনেক রহস্য এবং গভীর অনুধ্যান থাকলেও সাধারণভাবে পদ্মাবতী এবং রত্নসেনের প্রণয়ের প্রস্তাবনা যে কোন পাঠকের বিচারে ধরা পড়বে। সুতরাং তত্ত্বকে উদঘাটন না করলেও সহজ রস নিবেদনের সার্থকতা বর্তমান থাকে। আলাওল তার অনুবাদে প্রেমতত্ত্বের জটিল তাৎপর্যগুলি বাদ দিয়েছেন এবং রাজা ও কন্যার মিলনকে সুসহ এবং দ্রুত করবার জন্য শুধুমাত্র ঘটনার অনুক্রমকে রক্ষা করেছেন। আলাওলের অনুবাদ অংশে মূলের কয়েকটি স্তবক পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কিছু কিছু স্তবকের ভাব সংক্ষেপ ঘটেছে। অনুবাদ অংশে মূলানুসরণ সঙ্গত থেকেও ভাব-প্রকৃতিতে বাংলা কবিতার সঙ্গে আশ্চর্য রকম সুসমঞ্জস। বিশেষ করে রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দে এবং রাগ দীর্ঘ ছন্দে বক্তব্যগুলি নিবেদিত হয়েছে তা বাংলা কবিতার ধ্বনি-বিন্যাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মূলের শব্দগত অনুসরণ তিনি করেন নি কিন্তু প্রধান বক্তব্যকে বাংলার ত্রিপদীর প্রয়োজন বোধে কখনও বিলম্বিত কখনও দ্রুত ছন্দোবিন্যাসের মধ্যে উপস্থিত করেছেন। তাছাড়া তাতে সম্পূর্ণ অধ্যায়ে অন্যান্য যে ব্যতিক্রম আলাওল সৃষ্টি করেছেন তাতে অনুবাদটি জটিলতামুক্ত হয়েছে এবং মূলের অতিশয়োক্তির বন্ধনও অতিক্রম করতে পেরেছে। জায়সী তার কাব্যে সংস্কৃত শাস্ত্র সম্মত যে সমস্ত অলঙ্কার এ অধ্যায়ে প্রয়োগ করেছেন তা হচ্ছে অত্যুক্তি, বিষম, হেতুৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, অন্যোক্তি মালোপমা তথা ললিত, রূপকাতি-শয়োক্তি এবং সাধারণ ভাবে উদাহরণ-অলঙ্কার। আলাওল তার অনুবাদে পূর্ণভাবে শাস্ত্র-সম্মত এ সমস্ত অলঙ্কারের অনুসরণ করেননি। তাই তার অনুবাদ সহজ হয়েছে এবং সহজ তাৎপর্য-পূর্ণ আনন্দের বিষয় হয়েছে। যেমন মূলের দ্বিতীয় স্তবকে জায়সী বলছেন:

"উত্তরণ ক'রে দূত জিজ্ঞেস করলো তোমরা কি যোগী না বণিক। রাজার আজ্ঞা হ'য়েছে তোমরা গড় ছেড়ে দূরে অন্যত্র বিচরণ কর। কার ভিক্ষার জন্য তোমরা তোমাদের প্রাণ হাতে নিয়ে এখানে এসেছ? এখানকার রাজার প্রভাব ইন্দ্রের মতো। যখন সে ক্রোধযুক্ত হয়, তখন মৃত্যু

পর্যন্ত ভয়ে আত্মগোপন করে। যদি বণিক হ'য়ে থাক, তবে বাণিজ্য বেসাতি কর। যদি যোগী হও তবে যুক্তি দিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা কর। ভিক্ষা নিয়ে আপন মার্গে প্রত্যাবর্তন কর। এখানে দেবতা পর্যন্ত পরাভূত হ'য়েছে, আর হে ভিখারী তোমরাতো পতঙ্গের মত! তোমরা যোগী এবং বৈরাগী। আমার কথায় ক্রুদ্ধ হয়োনা। যা কিছু তোমার নিতে হয়, ভিক্ষা হিসেবে নিয়ে অন্যত্র চলে যাও।"

এখানে উপমা স্বরূপ কতকগুলি অত্যুক্তি অলঙ্কার এসেছে। প্রেম-তত্ত্বসমন্বিত কাব্যের প্রকৃতি বিচার করলে, কাব্যের শোভাবর্দ্ধনের কারণে এগুলোর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আলাওল তাঁর অনুবাদে যতটা সম্ভব অত্যুক্তি অলঙ্কারগুলি বর্জন ক'রেছেন। শুধুমাত্র বাংলা প্রবাদের একটি প্রচলিত অত্যুক্তি যোগ করেছেন—'নৃপতি সাক্ষাৎ যম।' আলাওলের পাঠ নিম্নরূপ—

"আসি রায়বার, কবি নমস্কার, বলে 'শুন গুরুদেব।
নৃপতি আদেশ, কথা সবিশেষ কহুঁ পদ করি সেব॥
যবে বনিজার মিলিয়া পশার, বিকিকিনি করে হাটে।
যবে যোগ শিক্ষা, মাগি লৈয়া ভিক্ষা চলহ আপন বাটে॥
গড়ের উনার কিসের অন্তর যাইতে চাহ কেবিরাজ।
এথাতে রহন কোন প্রয়োজন কিবা মনে চিন্ত কাজ॥
যবে আন ভাব তাতে নাহি লাভ বঝি দেখ সমাগম।
তিলেক কোপিলে, মরিবা সকলে, নৃপতি সাক্ষাৎ যম॥"

হেতুৎপ্রেক্ষার উদাহরণ স্বরূপ জায়সীর দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ উপস্থিত করছি ঃ

"তার দৃষ্টির বানে প্রতি রোমকুপ বিদ্ধ হ'ল, রক্ত নিঃসৃত হ'তে লাগলো সর্বাঙ্গে। রক্তের ধারা প্রবাহিত হ'ল নয়নে যার ফলে তার কাঁথা রক্তসিক্ত হ'ল। গোধূলিতে অস্তগামী সূর্য লাল হ'ল, বনে লাল হ'ল মঞ্জিষ্টা ও পলাশ ফুল। প্রতীত হ'ল যে বসন্ত ও বনস্পতি তার রক্তের স্পর্শে আরক্তিম হ'য়েছে। যোগী ও যতিদের গেরুয়া বসনও সে রক্তেই রঞ্জিত। পৃথিবীর যে যে অংশ সিক্ত হ'য়েছে সেখানেই রক্তবর্ণ। সকল

পাখী এবং তাদের পাখা রক্তবর্ণ হ'য়েছে। অগ্নির মধ্যে সতীর যে কায়া তাও রক্তবর্ণ, আর তার প্রতিবিম্ব পড়ে আকাশের মেঘও রক্তিম হ'য়েছে। সিক্ত হ'য়ে পাহাড়ও ইঙ্গুর বর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু তোমার একটি দ্রবিত হয়নি। চকোর এবং কোকিলের হৃদয়ে সহানুভূতি জেগেছে, তাই তাদের নেত্রও লাল। কিন্তু তুমি একবার ফিরেও তাকে দেখলেনা।"

অনুবাদে আলাওল মূলের ভাব-সংক্ষেপ ক'রেছেন এবং হেতুৎপ্রেক্ষাকে সহজ উপমায় রূপান্তরিত ক'রেছেন—

"মূর্চ্ছা সম্বরিয়া যদি জাগিয়া উঠিল ॥
প্রতি লোমকূপে যেন বিশিখ ফুটিল ॥
আঁখি যুগ অশ্রুপূর্ণ যেন রক্তধার।
তিতিয়া রাতুল বর্ণ হৈল কান্থা ভার ॥
অরণ ডুবিয়া পুনি রক্ত বর্ণ হএ।
পলাশ মঞ্জিষ্টা পুষ্প রাতুল যে হএ ॥
রাতুল বসন্ত আর যত বনস্পতি ॥
রাতুল যাবক আর যত যোগী যতি ॥
সিন্দূর হিঙ্গুল মেঘ রক্তবর্ণ হৈল।
সবে মাত্র তোমার শরীর না ঘর্ম্মিল ॥
ঘরেত আসিলা ফিরি না করিয়া দিঠ।
এক বারে হেন ভাবকেরে দিলা পিঠ ॥"

হেতুৎপ্রেক্ষার উদাহরণ জায়সীর কাব্যে অনেক আছে। উৎকর্ষের ব্যঞ্জনার জন্য এ-অলঙ্কার খুবই শক্তিশালী। কার্য এবং কারণ এক সঙ্গে প্রধানতঃ দৃশ্যগোচর হয় না। কারণ প্রায়শঃ পরোক্ষ থাকে। অত্যুক্তি যতই থাকুক না কেন, লুব্ধ চিত্ত একটি দৃশ্যমান বস্তুর সৌন্দর্য এবং স্বভাবের কারণ অন্বেষণ করতে থাকে এবং একটি উদার কাল্পনিক হেতু নির্মান করে আনন্দিত হয়। যেমন রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে আছে—'সহস কিরিণ জো সুরূজ দিপাঈ। দেখি লিলার সৌউছপি জাঈ ॥'—সহস্র কিরণে দীপান্বিত যে সূর্য সেও তার ললাট দেখে আত্মগোপন করে।

মালোপমা অলঙ্কারের উদাহরণ জায়সীতে আছে। এটি একটি উপমালঙ্কার যেখানে একটি উপমেয়র অনেকগুলো উপামন থাকে। এবং

প্রত্যেক উপমানের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হয়। উদাহরণ স্বরূপ অষ্টাদশ স্তবকের অনুবাদ উপস্থিত করছি :

"পুণরায় প্রিয়তম, আমি এখানে তোমার জন্য এতাদৃশ অনুরক্ত যে তোমার পত্র প্রাপ্তিই আমার জন্য অর্ধসাক্ষাৎকারের মতো। ভ্রমর যখন কেতকীকে পেতে চায় তখন সে যেমন কণ্টকের কথা চিন্তা করে না, প্রীতি নির্বাহের জন্য তুমিও তেমনি প্রতিবন্ধকের কথা চিন্তা করবেন। তুমি পতঙ্গ হ'য়ে ওষ্ঠে দীপক-জ্যোতি ধারণ কর। মরজিয়া বা ডুবুরি হ'য়ে সমুদ্রের অতল থেকে আমাকে গ্রহণ কর। তোমার অনুরাগ দীপকের শিখার মতো আরক্তিম হোক। যেভাবে স্বাতীর একবিন্দু পানির জন্য শুক্তি অপেক্ষা ক'রে থাকে, তুমি তেমনি অপলক নেত্রে আমার প্রেমের প্রতীক্ষায় থাক্‌বে। যেভাবে চাতক পিউ পিউ আর্তস্বরে পিপাসা জ্ঞাপন করে কিন্তু স্বাতীর একবিন্দু পানির আশায় অন্য কোনও পানি পান করে না। যেভাবে সারস আপন সঙ্গী থেকে বিযুক্ত হ'য়ে ব্যাকুল হয়। যেভাবে চকোর চাঁদের দিকে একাগ্র নয়নে চেয়ে থাকে, সেভাবেই তোমাকে একনিষ্ঠ হ'য়ে প্রেমাকুল চিত্তে অপেক্ষা করতে হবে। কমলদলের মধ্যে সূর্যের লগ্ন যেভাবে ব্যাপ্ত হয়, আমিও তেমনি তোমার জন্য অনুরক্ত। যেভাবে অর্জুন মৎস্যভেদ ক'রে বিজয়ী হ'য়ে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন, সে ভাবেই তুমি সর্বপ্রকার বিঘ্ন দূর ক'রে আমাকে লাভ কর।"

কবি বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়ে নায়িকার আগ্রহের তীব্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সর্ব বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে দুইটি আগ্রহী চিত্তের সম্মিলনে প্রেমের যে উদারতা জায়সী অনবরত উপমার মাল্য রচনা ক'রে পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপে তাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ক'রেছেন। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এহেন রূপভিব্যক্তি অসাধারণ।[১৬] আলাওলের কাব্যে এ-অংশের অনুবাদ নেই, অনুসরণও নেই। নায়িকার পত্ররূপে আলাওলের কাব্যে যে বক্তব্য এসেছে তা' নিম্নরূপ—

"মহিমা লিখিয়া পূর্ব্বে, অনেক প্রণাম তবে,
কুশল জানাই কিছু লেশ।
লিখি প্রেম অনুরাগ, বিরহবৈরাগ্য ভাগ,
কার্যভাগ জানাইল শেষ॥

তোমার রহস্য কথা, শুক মুখে শুনি বার্ত্তা,
পূজা ছলে গেলুঁ দেখিবারে।
দরশে হরিল চিত, ভাবে হৈল মুরছিত,
কুল লাজে বিড়ম্বিলো মোরে॥
তুমি হৈলা নিদ্রাগত কার্যে হৈলা অনুগত,
সমুচিত নহে হেন কর্ম।
রচিয়া চন্দন জলে, অক্ষর লিখিল ছলে
তথাপিহ না বুঝিলা মর্ম॥
না হৈল সে কার্য সিদ্ধি বঞ্চিত হইল বিধি,
লাজ হেতু না কৈহুঁ প্রচার।
জীবন তথাত থুইয়া শূণ্য অবয়ব লৈয়া,
চলি আইলুঁ গৃহে আপনার॥
যে কিছু কহিল হরে, মনেত স্মরিয়া তারে
উঠ আসি গড়ের উপর।
দুয়ার না পাও যবে, সিন্ধ দিয়া আইস তবে,
ব্যর্থ না হইব হর বর॥
যদি কর প্রাণ পণ, পাইবা বাঞ্ছিত ধন,
দুই ভাবে নাহি সিদ্ধি মত।
সর্বত্র তাহারে ভাব, যেই ভাবে এক ভাব,
সূচি রন্ধ্রে চালাএ পর্বত॥

এখানে কয়েকটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে মাত্র। মূলের প্রেমের ব্যঞ্জনা বাংলা কাব্যে আশ্রয় পায়নি। মূলে যে অনুরাগ কৌতূহল এবং রহস্য ছিলো এবং দেহ-দাহনে চিত্তশুদ্ধির যে পরিচয় ছিলো আলাওলের কাব্যের এ-অংশে তার পরিচয় নেই। মূলে যেখানে আছে 'হাম চঢ়ৌ মৈঁ তেহিকে প্রথম করৈ অপনাস"—যে প্রথমে আত্মবিনাশ করে তার হাতেই আমি ধরা দেব। বাংলাতে সেখানে আছে—"যদি কর প্রাণ পণ, পাইবা বাঞ্ছিত ধন।"

মূলের যে অংশের ওপর আলাওল নির্ভর করেছিলেন সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র সংবাদ-পরিক্রমা নেই। জায়সী সাধারণ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন যে, প্রেমের জন্য যারা প্রাণ সংশয় করেছে তারাই প্রিয়তমাকে পেয়েছে এবং এ পথে রাজা রত্নসেন একাকী

নন, তার পূর্বে অতীতে আরো অনেকে ছিলেন। এরপর জায়সী প্রচলিত লোক কাহিনীর অনেক প্রেমিক প্রেমিকার নাম উল্লেখ করেছেন। আলাওল মূলের এই রহস্য এবং তাৎপর্য গ্রহণ না করে শুধুমাত্র কাহিনীর কার্যক্রমকে অনুসরণ করেছেন। ফলে আলাওলের বক্তব্য এসব ক্ষেত্রে প্রধানতঃ কাহিনী-ভিত্তিক হয়েছে।

যখন শুক রত্নসেনের হাতে কন্যা পদ্মাবতীর পত্র এনে দিল, তখন রাজার চাঞ্চল্য এবং উল্লাসের পরিচয় আলাওল যেভাবে দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল।

প্রিয়তমা পত্র সত্য অর্দ্ধ দরশন।
হৃদের উপরে থুইলা করিয়া যতন॥
অগ্নিসম উষ্ণ হৈল হৃদয় আনলে।
দাহন তরাসে থুইল নয়নের জলে॥
নয়নের জলে পত্র আমার নষ্ট হয়।
তথাত হৈতে পুনি থুইল হৃদয়॥
এই মতে পুণি পুণি হৃদয় নয়নে।
প্রিয়া-পত্র রাখিলেন্ত পরম যতনে॥
মস্তক উপরে থুইলে দেখন না যায়।
পরম যতনে প্রাণ মাঝে থুইতে চায়॥
প্রাণের উপর থুইতে পন্থ না পাইয়া।
মস্তকে রাখিল পত্র মনেত ভাবিয়া॥

দেখা যাচ্ছে যে এখানকার প্রধান ঘটনা মাত্র একটি রাজা প্রিয়তমার পত্র পেয়ে তা মাথার উপর রাখলেন। আলাওল এ সংবাদটিকে নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এ বলার মধ্যে যথার্থ কোনও রূপক বা উৎপ্রেক্ষা জাগ্রত হয়নি। মূলে এখানে এই একটি কথাই আছে মাত্র, তার অতিরিক্ত কোন বর্ণনা নেই। জায়সী বলছেন—

পাতি লীন্হি লেই সীস চঢ়াবা।
দীঠি চকোর চন্দ জস পাবা॥

অর্থাৎ তিনি হাত পেতে চিঠিটি নিয়ে শিরোদেশে রাখলেন। তিনি যেন চকোর, সে তার দৃষ্টিতে চাঁদকে পেয়েছে।

এখানে একটি মাত্র উপমায় ভাবের যে প্রগাঢ়তা এসেছে এবং বিকল প্রেমিকের চিত্তে আশ্বাসের যে পরিচয় ফুটেছে আলাওলের কাব্যে তা অনুপস্থিত।

পত্র প্রাপ্তির পর রত্নসেন প্রস্তুত হলেন রাজদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য। এখানেই রাজা-গড় আক্রমণ খণ্ডের শেষ।

॥ ৭ ॥

পরবর্তী সর্গ গন্ধর্ব সেন মন্ত্রী খণ্ড।[১৭] রাজা গন্ধর্বসেন যখন শুনলেন যে যোগীগণ দুর্গে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে তখন তিনি পণ্ডিতগণের কাছে মন্ত্রণা চাইলেন। পণ্ডিতগণ বেদ অধ্যয়ণ করে বললেন যে যোগী হচ্ছে মৌমাছির মতো যে মালতী পুষ্পকে অধিকার করে। যেমন ভাবে চোর দেয়ালের মধ্যে গর্ত করে মাথা ঢুকিয়ে দেয় সেভাবেই মৌমাছিও মধু আহরণের জন্য মালতী পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করে। এরা উভয়েই নিজেদের জীবন নিয়ে খেলা করে। যে পথ দিয়ে যাত্রা করা উচিৎ সে পথ দিয়ে তারা চলে না, তারা অর্থাৎ যোগীরা শূলে আরোহণ করে স্বর্গে যেতে চায়। এরা তস্কর, রাজার ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করতে এসেছে সুতরাং আপনি তাদের শূলবিদ্ধ করতে পারেন।

একথা শুনে রাজার মন্ত্রীরা বললেন যে যোগীদের চৌর্যপদ্ধতি দেখে মনে হয় যে এরা সিদ্ধা। সিদ্ধাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে রাত্রি দিন পথ চলে। যেখানে তাদের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই তারা অগ্রসর হয়। সিদ্ধাগণ এতই নিঃশঙ্ক যে যদি তারা তাদের সামনে খড়্গ দেখে তবে সেখানে মাথা পেতে দেয়। শক্তির দ্বারা সিদ্ধাকে পরাভূত করা যায় না। সিদ্ধা হল অমর তাদের কায়া হল পারদের মত। ছলে এবং কৌশলে তাদের পরাভূত করা যায়, শক্তির দ্বারা নয়। তখন গন্ধর্ব সেন সৈন্য সামন্ত সুসজ্জিত করলেন, চব্বিশ লক্ষ ছত্রপতি প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য, ছাপ্পান্ন কোটি সৈন্য যুদ্ধের দামামা বাজাল, বাইশ হাজার হস্তী যাত্রা করল এবং পৃথিবী তার সমস্ত পর্বতমালা নিয়ে এদের পদভরে কম্পিত হ'ল। রত্নসেনের সঙ্গীগণ যুদ্ধের এ ভয়ানক প্রস্তুতি দেখে রত্নসেনকে বলল, "আমরা এই দিনেরই অপেক্ষায় ছিলাম। অনুমতি

দিন, আমরা এদের সম্মুখীন হই। আজকের দিনে আমাদের জন্য সাক্ষী হবে সত্য।" রত্নসেন শিষ্যগণকে আশ্বস্ত করে বললেন, "তোমরা হলে সিদ্ধা, প্রেমের দ্বারদেশে উপনীত হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করো না। যে শিরোদেশকে বিনয়ে নত করেছো আত্মোৎসর্গের জন্য সে শিরোদেশকে উদ্ধত কোরো না।"

উপরে মূল পদ্মাবতের গন্ধর্বসেন মন্ত্রী খণ্ডের প্রথম পাঁচটি স্তবকের ভাব সংক্ষেপ দিলাম। আলাওল এ পাঁচটি স্তবকের কাহিনীক্রমকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন এবং ভাব ব্যাখ্যারও বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেন নি। সংখ্যাগণনারূপে যে কথাগুলো এসেছে সেগুলো অতিশয়োক্তি এবং অজস্র অর্থে। লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি এ সমস্ত সংখ্যা মধ্যযুগের কাব্যে প্রচুরতার দ্যোতক। অল্প কিছু পরিবর্তন আছে উভয় কবির মধ্যে। প্রথম স্তবকে জায়সী যেখানে শুধু মাত্র পণ্ডিতের কথা বলেছেন, আলাওল সেখানে বলেছেন মন্ত্র পণ্ডিতের কথা। দ্বিতীয় স্তবকে মূলের মন্ত্রীগণের স্থলে একজন বিশেষ মন্ত্রীর কথা এসেছে যার নাম রামা। জায়সীর পঞ্চম স্তবকের বক্তব্য ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম স্তবক পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাওল এখানে ভাব-সংক্ষেপ করেছেন।

এরপরে মূলের সঙ্গে আলাওলের কাব্যের ঘটনা বিন্যাসের কিছু ব্যতিক্রম এসেছে। মূলে আছে যখন রাজা রত্নসেন শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন ধৈর্য ধারণ করবার জন্য তখন সর্বশেষে তিনি পদ্মাবতীর নাম উল্লেখ করছেন। তিনি বলছেন যে প্রেমের দুয়ারে দাঁড়িয়ে একমাত্র আকাঙ্খা তাঁর পদ্মাবতীর। পদ্মাবতী তাঁর কাছে প্রদীপের শিখার মতেপ। পদ্মাবতী হল পদ্মমুখী তার হাসি হল ফুলের মতো এবং তাঁর অশ্রু হল মুক্তা। রত্নসেনের এ উক্তির পর জায়সী সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীকে উপস্থিত করেছেন। শিষ্য পরিবৃত রত্নসেনকে ফেলে আমরা সখীগণ পরিবৃত পদ্মাবতীর কাছে উপস্থিত হই। আলাওলে এই অংশ অন্যরূপে আছে। শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়ে রত্নসেন যোগাসনে বসলেন। রাজ সৈন্যদল চিত্রপুত্তলিকার মতো চৈতন্য রহিত রত্নসেনকে দেখে গন্ধর্বসেনের কাছে সংবাদ দিল। গন্ধর্ব সেনের আদেশে রত্নসেন বন্দী হয়ে আনীত হলেন রাজ সাক্ষাতে। রাজা তখন রত্নসেনকে আত্মপরিচয় দিতে বললেন। কিন্তু আত্ম-পরিচয়ে কৌতুক এবং অস্পষ্টতার ইঙ্গিত পেয়ে গন্ধর্বসেন ক্রুদ্ধ হয়ে রত্নসেনকে শূলবিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন। রত্নসেনকে যখন বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন প্রাসাদের উচ্চ প্রকোষ্ঠ থেকে বন্দী রত্নসেনকে দেখে পদ্মাবতী

চেতনা রহিত হলেন। তখন সখীগণ অঙ্গসেবা করে পদ্মাবতীর পরিচর্যা করতে লাগল। আলাওল ঘটনা ধারার মধ্যে স্বাভাবিকতা আনবার চেষ্টায় পদ্মাবতীর অস্থিরতার একটি কারণ নির্দেশ করেছেন। মূলে যেখানে আছে রত্নসেনের বিপদ সংবাদ পদ্মাবতীর কর্ণগোচর হবার পূর্বেই পদ্মাবতী প্রেমের প্রগাঢ় অনুভূতিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে রত্নসেন বিপদগ্রস্থ, আলাওল সেখানে রত্নসেনের বন্দীদশাকে পদ্মাবতীর নয়নগোচর করিয়ে পদ্মাবতীকে আকুল করিয়েছেন।

এ স্বর্গের শেষের দিকে দুঃখিত ও বিরহ ব্যাকুল পদ্মাবতী হীরামণিকে কাছে পেয়ে তার কণ্ঠলগ্না হয়ে ক্রন্দন করছে। এখানে আলাওল পদ্মাবতীর আকুতিকে গানের সুরে প্রকাশ করেছেন। এই অংশটুকু ভাব অভিব্যক্তিতে মূলের অনুগত নয়। মূলের সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ স্তবকে পদ্মাবতীর আক্ষেপ উক্তি আছে। সে আক্ষেপ উক্তি অনেক বিস্তৃত এবং তত্ত্বরহস্যে জড়িত। গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে যে ভাব সম্মিলন, জায়সী সে ভাব সম্মিলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আলাওলের কাব্যে এর ভাব সম্মিলনের প্রকাশ নেই। তিনি সংসার আশ্রমে প্রেম অনুরাগের তাৎপর্যের মধ্যে নরনারীর যে আকর্ষণ এবং বেদনা তার পরিচয় এনেছেন। আলাওলের কাব্যে এ অংশটুকু সর্বতোভাবে মানবীয়। বাংলা কবিতায় পঞ্চদশ স্তবকে হীরামণি শুক পদ্মাবতীকে প্রবোধ দিচ্ছে। এ অংশটুকু মূলের বিংশ স্তবকের অনুসরণ।

॥ ৮ ॥

পরবর্তী সর্গ রত্নসেন-শূলী-খণ্ড।[১৮] মূল হিন্দী 'পদুমাবতের' এই সর্গের অনেকগুলো পাঠ ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। গ্রীয়ার্সন এবং সুধাকর দ্বিবেদী[১৯] সম্পাদিত 'পদ্মাবতীতে' মোট বাইশটি স্তবক আছে। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন গ্রন্থে[২০] মোট আঠারোটি স্তবক আছে। মানের শরীফ খানকায়[২১] রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে পনেরটি স্তবক আছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, মানের শরীফের পাণ্ডুলিপির পাঠই কাহিনী ও পারম্পর্যের দিক থেকে একমাত্র সঙ্গত পাঠ। আলাওলের কাহিনীক্রমটি মানের শরীফের অনুগত। গ্রীয়র্সন এবং শুক্লর নির্ধারিত পুনরাবৃত্তি দোষ আছে। মানের শরীফের পাঠ

অনুসরণ করে আমরা এই সর্গের প্রাথমিক কয়েকটি স্তবকের অনুবাদ উপস্থিত করছি।

১।। বন্দীদশায় সকল তপস্বীকে বধ্যভূমিতে আনা হল। সিংহলের পুরবাসীগণ এ দৃশ্য দেখতে জটলা করলো। সর্বপ্রথম উপস্থিত করা হল গুরুকে অর্থাৎ রত্নসেনকে শূলী বিদ্ধ করবার জন্য। সুন্দর রত্নসেনকে দেখে সকলেই দুঃখ করতে লাগলো। সকলেই বলতে লাগলো, এ ব্যক্তি যোগী নয়—এ বিয়োগ ব্যথাতুর কোনও রাজপুত্র হবে। নিশ্চয়ই কারও প্রেমাকুল হয়ে এ যোগী হয়েছে। বক্ষ স্থলে মাল্য ধারণ করে মুখে প্রেমিকার নাম জপ করছে। যখন হত্যা-সময় ঘোষণা করে তূর্য বাজলো শূলী দেখে সে মনসুরের মত হাস্য করলো। বিদ্যুতের মতো চমকিত হল তার দর্শন, সে ঔজ্জ্বল্যে যে যেখানে ছিলো তড়িতাহত হল। সকলেই তখন বলতে লাগলো, সন্ধান করা দরকার এর সত্যিকারের পরিচয় কি? এ হয়তো ছদ্মবেশে রাজা ভোজও হতে পারেন। সকলেই যোগীকে প্রশ্ন করলো, যোগী তুমি তোমার জাতি জন্ম এবং নাম বল অর্থাৎ তোমার পরিচয় দাও। সকলেই যখন কাঁদছে তখন তুমি হাস্‌ছ—এর ভেদ কি বুঝিয়ে বল।

২।। যোগী বললো তোমরা আমার জাতির কথা কি জিজ্ঞেস করছো? আমি তো যোগী এবং তপস্যারত ভিখারী। যোগীদের কোন জাতি থাকে না। অপমান করলে তারা ক্রুদ্ধ হয় না, আঘাত করলে লজ্জা অনুভব করে না। নির্লজ্জ ভিখারী লজ্জা হারিয়েছে তার সন্ধানে কি প্রয়োজন। যার হৃদয় মৃত্যু কামনায় আকাঙ্ক্ষিত, শূলী দেখে সে কেন হাসবে না? অদ্য প্রেমের নিষ্পত্তি ঘট্‌বে। আজ আমি পৃথিবী ত্যাগ করে গগনে গমন করবো। কায়া পিঞ্জরের বন্ধন মুক্ত হয়ে প্রাণ পক্ষী মুক্তি পাবে। আজ প্রেমের সঙ্গে প্রিয়তম চলে যাবে এবং এ ভাবেই প্রেমের নিস্তার ঘটবে। আজ শিরোদেশ পর্যন্ত মৃত্যু এসে পৌঁছেছে, রক্তিম মুখ নিয়ে অর্থাৎ প্রণয়ে পূর্ণ হয়ে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। এখন দ্রুত আমাকে হত্যা কর এবং এ সমস্ত প্রশ্ন অর্থাৎ জাতি, জন্ম, নাম আর জিজ্ঞেস করোনা।

৩।। তারা রত্নসেনকে বললো, যাকে স্মরণ করতে ইচ্ছে হয় তাকে স্মরণ কর। আমরা এখন তোমাকে এমন ভাবে শূলীবিদ্ধ করবো যেমন কেতকীর

কাঁটা ভ্রমরকে বিদ্ধ করে। রাজা বললেন, আমি তো প্রতিবার তার কথাই স্মরণ করি যার সঙ্গে জীবন ও মৃত্যু দুই অবস্থাতেই আমি সম্বন্ধযুক্ত। আমি সেই অভিরাম পদ্মাবতীর কথা স্মরণ করি যার নামে আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত। আমার শরীরে রুধিরের যতটি বিন্দু আছে তারা পদ্মাবতী পদ্মাবতী উচ্চারণ করছে। যদি জীবিত থাকি তবে রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে পদ্মাবতী অবস্থান করবে, যদি মৃত্যু হয় তবে তার নাম উচ্চারণ করেই মৃত্যু বরণ করবো। দেহের প্রতিটি রোম বিন্দু তার নামের সঙ্গে যুক্ত যেন সূত্রের দ্বারা তারা প্রাণের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে বিশুদ্ধ হয়েছে। আমার হাড়ের মধ্যে এবং প্রতিটি শিরায় তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। যেখানে বিরহ জাগ্রত হয়েছে, সেখানে হাড় এবং মাংসের হানিতে ক্ষতি কি? আমিতো একটি আধার মাত্র হয়েছি যা পদ্মাবতীর রূপকে ধারণা করেছে।

৪॥ রাজা রত্নসেন দৃষ্টি আনত করে বসে রইলেন কিন্তু এ অবস্থা ভাটের সহ্য হলনা অর্থাৎ রাজা যে আপন পরিচয় না দিয়ে চুপ করে আছেন এ অবস্থা ভাটের অসহ্য মনে হল। হাতে কটার (একপ্রকার অস্ত্র) নিয়ে বললো, মঞ্জুষায় বদ্ধ থাকা পুরুষের শোভা পায়না অর্থাৎ সত্যিকারের পরিচয় গোপন রাখা অশোভন। যখন কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে কংসকে হত্যা করেছিলেন তখন তার বংশের পুরুষার্থ প্রকট হয়েছিলো। যেখানে গন্ধর্বসেন ক্রোধযুক্ত হয়ে বসেছিলেন, ভাট সেখানে তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হল এবং বা হাত তুলে আশীর্বাদ করলো। ক্রুদ্ধ হয়ে গন্ধর্বসেন বললেন, এ কেমন যোগী এবং অশিষ্ট ভাট? যেখানে সমস্ত রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সে আমাকে বা হাত তুলে আশীর্বাদ করলো? ভাট বললো, যোগী হল পানি এবং হে রাজন তুমি হলে অগ্নি। অগ্নির উচিত নয় পানির সঙ্গে যুদ্ধ করা।

পানি অগ্নিকে নির্বাপিত করে। হে রাজন বুদ্ধিমন্ত হও, যুদ্ধ কোরনা তোমার দরজায় সে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে এসেছে, তাকে ভিক্ষাদান কর—যুদ্ধ নয়।

৫॥ ইনি যোগী নন, ইনি একজন নৃপতি। যদি সত্যিকারের ভেদ আপনার জানা থাকে তা হ'লে সন্ধান করুন। যদি যুদ্ধ হয় তা হ'লে তা

হবে মহাভারতের মতো, তার সহায়তায় সমস্ত যোদ্ধারা এগিয়ে আস্‌বে। মহাদেব তখন রণঘণ্টা বাজালেন, সে শব্দ শুনে ইন্দ্র চলে এলেন। অস্ত্রধারণ করে এলেন বিষ্ণুমুরারী। সহায়তার জন্য দৌড়ে এলো ইন্দ্রলোকের সকলে। পাতাল থেকে ফনা বিস্তার করে এলো সর্পপতি, পার্শ্বে দণ্ডায়মান রইলো অষ্টকুল নাগ। তেত্রিশ কোটি দেবতারা রণসজ্জায় সজ্জিত রইলো এবং নিরানব্বই স্তবক মেঘদল গর্জ্জন করলো। ছাপ্পান্নো কোটি বৈশ্বস্বর প্রজ্জ্বলিত হ'ল। এবং সোয়ালক্ষ পর্বত কম্পিত হ'ল। এগিয়ে এলেন নয় নাথ এবং চুরাশী সিদ্ধা। বিদ্যুতের আবর্তনে ভূমি জ্বলতে লাগলো, গরুড় এবং গৃধিনী আকাশে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো।

৬॥ রাজা বললেন কে এই অশিষ্ট ভাট যে বা হাত তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছে? আমার নগরের মধ্যে এমন কোন যোগী আছে যে সিঁদ কেটে আমার গড়ের মধ্যে চুরি করার ইচ্ছায় প্রবেশ করতে চায়। ইন্দ্র আমার ভয়ে ভীত এবং আমার সামনে মাথা নত করে। শেষ নাগকে যিনি দমন করেছিলেন সেই কৃষ্ণও আমার ভয়ে ভীত। চতুর্মুখ ব্রহ্মা আমাকে ভয় করে। আমার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়, তথা সুমেরু, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ এবং কুবের পর্যন্ত বিচলিত হয়। যে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ দেখা যায় সেই মেঘ এবং পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছে যে কুর্ম সেও আমাকে ভয় পায়। যদি আমি চাই তবে কেশ আকর্ষণ করে সকলকে ধ্বংস করতে পারি। কীট পতঙ্গের সদৃশ এ নরেশের আবার কি মূল্য আছে?

ভাট বলল, হে রাজন, শ্রবণ কর, কোন প্রাণীর গর্ব করা শোভা পায় না। কুম্ভকর্ণের করোটির মধ্যে ডুবতে ডুবতে কোনক্রমে ভীম রক্ষা পেয়েছিলেন [গল্প আছে যে মহাপরাক্রমশালী ভীম একবার গর্ব করেছিলেন যে কুম্ভকর্ণ যদি জীবিত থাকত তবে তিনি তাকে সমুদ্রে ফেলে দিতেন। এর কিছুদিন পরে একটি বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে ভীম আকস্মিকভাবে নিপতিত হন এবং অনেক কষ্টে রক্ষা পান। তীরে উঠার পর তিনি আবিষ্কার করলেন যে বৃহৎ জলাশয়টি ছিল জলপূর্ণ কুম্ভকর্ণের করোটি।]

৭॥ গর্বিত রাবণ রামের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল এবং সেই গর্বের ফলে একটি সংগ্রামের সূচনা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে রাবণের সমকক্ষ আর কে ছিল?

তার ছিল দশটি মস্তক এবং বিশটি ভূজদণ্ড। যার রসুইঘর সূর্যের আলোতে তপ্ত হত এবং যার বস্ত্র সমুদ্র ধৌত করত। শুক্র ছিল তার মন্ত্রনাদাতা এবং চন্দ্র ছিল তার মশালবাহক। বাতাস সর্বক্ষণ তার দ্বারদেশ পরিস্কার রাখত। যমকে পরাভূত করে আপন পালঙ্গের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। এমন কেউ ছিল না যে স্বপ্নেও তার প্রতিপক্ষতা করতে পারে। বজ্রের সদৃশ অবিচল যে রাবণ সেও দুজন তপস্বীর দ্বারা আহত হয়ে মারা গেল। দশ কোটি ছিল তার পুত্র প্রপৌত্র কিন্তু তার জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেলার কেউ রইলো না। অন্য কাউকে ছোট ভেবে কেউ যেন আত্মগর্ব না করে, যে ক্ষুদ্র এবং দুর্বল তার সঙ্গে যদি ভগবান থাকে তবে সেই বিজয়পত্র লাভ করে।

৮॥ রাজার ক্রোধ দেখে রাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান ভাট বিনয়ের সঙ্গে বলল, ভাট হল শঙ্করের অবতার, সে ইচ্ছে করলে রাজার সামনে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও ভাট দিশাহারা হয়না। এহেন ব্যক্তির উপর ক্রোধ প্রকাশ করে কোন লাভ আছে কি? রাজা গন্ধর্বসেন তখন বললেন, কেন তুমি মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে উঠেছো? কেন তুমি এ প্রকার অশোভন উক্তি করছো? এমন শব্দ কেন উচ্চারণ করছো না যাতে লোকের উপকার হয়। তুমি ভাট জাতিকে কলঙ্কিত করেছো কেননা তুমি বা হাত তুলে আশীর্বাদ কর। ভাট হয়েছো বলে তোমাকে আমি প্রাণদণ্ড কি করে দিই। এখন গ্রীবা আনত করে তোমার বক্তব্য বল। তুমি হলে ভাট এবং সে হল যোগী। তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? এসব ছলনায় তোমাদের কি লাভ? তুমি কি বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়েছো?

৯॥ হে রাজন গন্ধর্বসেন, যদি আমাকে সত্য জিজ্ঞেস কর আমি সত্যই বলব। তাতে আমার শিরে বজ্র নিপতিত হোক, কিছু আসে যায় না। মৃত্যুতে ভাটের ভয় কি? তার হাতে কটার আছে যা দিয়ে পেটে আঘাত করে সে মৃত্যু বরণ করতে পারে। জম্বুদ্বীপে চিতোর নামে এক দেশ আছে সেখানে চিত্রসেন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। রত্নসেন তারই পুত্র, ইনি চৌহান গোত্রের। এঁকে কেউ পরাভূত করতে পারেনা। যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি সুমেরুর মতো অটল। সমস্ত সংবাদ বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও ইনি বিচলিত হবেন না। সমুদ্রের মতো তাঁর দান ভাণ্ডার, অনবরত দানেও তা কখনও হ্রাস পায় না। একবার যে তার কাছে দান পেয়েছে অন্যের কাছে তার আর প্রার্থনার

প্রয়োজন করেনা। আমি ডান হাত তুলে তাকেই একমাত্র আশীর্বাদ করি। আর কে আছে যাকে আমি সমভাবে সম্মান জানাতে পারি ?

আমার নাম মহাপাত্র। আমি একমাত্র তাঁর কাছেই ভিক্ষাপ্রার্থী। যে কঠোর শব্দ উচ্চারণে মানুষের মনে ক্রোধ জাগে সন্দেশবাহক দূত সে শব্দ উচ্চারণ ক'রতে পারে।

এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভাট ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে ছদ্মবেশী মহাদেব। তিনি তখন আত্মপ্রকাশ করে গন্ধর্বসেনকে সমস্ত সংবাদ দিলেন। তিনি জানালেন কি করে গন্ধর্বসেনের সুচতুর শুকপক্ষী হীরামণি চিতোর যেয়ে রত্নসেনকে পদ্মাবতীর সংবাদ দিয়েছিল এবং এ-সংবাদে উৎসাহিত হয়ে রত্নসেন সিংহল দ্বীপে এসেছেন। গন্ধর্বসেন হীরামণির নাম শুনবামাত্র তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হলেন। তিনি জানতেন যে হীরামণির পাণ্ডিত্যে কোনো ছলনা নেই। পিঞ্জরাবদ্ধ হীরামণি যখন তার সামনে এলো, তিনি তখন প্রশ্ন করলেন, "তুমি বেদজ্ঞানী এবং শাস্ত্রবিদ, তুমি কেন আমার দুর্গের সৌভাগ্য হরণকারী এই যোগীদের এখানে ডেকে এনেছো ?" হীরামণি তখন সমস্ত সংবাদ রাজাকে দিল এবং বল্‌ল যে রত্নসেন হচ্ছেন বত্রিশ লক্ষণযুক্ত রাজপুত্র এবং তিনি হচ্ছেন সহস্র কিরণযুক্ত অংশুমালীর তুল্য। পদ্মসদৃশ রাজকুমারকে দেখে অস্তি অস্তি বলে সমস্ত জনতা সমস্বরে কলরব তুল্‌ল। যুদ্ধ ঘোষণার জন্য যে বাদ্যযন্ত্র নিযুক্ত হয়েছিল সে বাদ্যযন্ত্রে এখন উৎসবের আনন্দ ঘোষিত হল।

আলাওলের পদ্মাবতী-পাঠ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তিনি মানের শরীফের পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত পাঠই অনুসরণ করেছিলেন। শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে এ অনুসরণটি ধরা পড়ে, কিন্তু চরিত্র, আবেগ এবং উৎসাহ আলাওলে যে ভাবে চিত্রিত হরেছে তা জায়সীর অনুগত নয়।

শুধুমাত্র এ সর্গেই নয়, আমরা অন্যত্রও লক্ষ্যকরেছি যে জায়সীর কাব্যে নায়ক পুরুষ অতি মহিমান্বিত এবং দেবোপম। জনসাধারণের সঙ্গে তার ব্যবধান প্রচণ্ড, জনসাধরণ তার পায়ে অর্ঘ দেয় এবং তাকে অর্চনা করে এবং নায়ক-পুরুষ আপন অধিকার বশেই যেন সে অর্চনা নিশ্চিন্তে গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নায়ক-চরিত্রের অন্য একটি বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে, সে

যেন সাধারণ মানব সমাজের গৃহগত সৌজন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে না। তাই তাকে পিতা হিসাবে অথবা পুত্র হিসাবে অথবা স্বামী হিসাবে প্রতিদিন সংসারের মমতা এবং প্রয়োজন-আয়োজনের মধ্যে আমরা পাইনা। শুধুমাত্র জায়সীতেই নয়, মধ্য যুগের হিন্দী সাহিত্যে এই রীতি প্রকৃতির ব্যতিক্রম প্রধানতঃ পাওয়া যায় না।

তুলসীদাস[২২] তার 'রাম চরিতমানসে' রামচন্দ্রকে একজন বরণীয় মহৎ নায়ক হিসাবে অঙ্কিত করেছেন। সর্বপ্রকার গৌরবের এবং ঐশ্বর্যের অধিকার একমাত্র তারই আছে এবং জনসাধারণ তার সামনে মাথা নত করছে শ্রদ্ধায়, ভয়ে এবং প্রার্থনায়। তিনি রামচন্দ্রের বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে জীবনযাপনের উল্লেখও আছে কিন্তু রামচন্দ্রের মহৎ জীবনের অঙ্গীকারের মধ্যে এগুলো অলৌকিক আনন্দের উপঢৌকন রূপে এসেছে। সংসার এবং সমাজের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক যা আমরা পাই স্নেহ, প্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, দুর্দশা এবং বঞ্চনার মধ্যে এবং যা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অসাফল্যের মধ্যেই ধরা পড়ে তার কোন পরিচয় রাম-চরিতমানসে নেই, যেমন নেই জায়সীর পদ্মাবতে।

আলাওল রত্নসেন এবং গন্ধর্বসেনের সম্পর্ককে একটি আদর্শভিত্তিক সম্পর্করূপে গড়ে তোলেন নি। আদর্শের অনুসরণ থাকলেও বিবাহ এবং কন্যা সম্প্রদানের সময় তিনি সমাজ ও সংসারের মধ্যে মানুষে যে সম্পর্ক সে সম্পর্কের কথাই ভেবেছেন। যখন বিদগ্ধ শুক গন্ধর্বসেনকে বলছে—

কন্যা গৃহে জন্মিছে অবশ্য বিভা দিবা।
হেন যোগ্য জামাতা কোথাত পাইবা॥

এখানে আমরা দেখছি জায়সীর মত আলাওল শুধুমাত্র রত্নসেনের গুণ-ব্যাখ্যাই করেন নি, জামাতা হিসাবে তিনি কত উপযুক্ত তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। এই উক্তিতে দুটি সত্য স্পষ্ট হয়। একটি হল—কন্যা যৌবনবতী হলে তার বিবাহের জন্য পিতা অত্যন্ত চিন্তিত থাকেন এবং পাত্র সন্ধান করেন এবং দ্বিতীয়তঃ অর্থে ও বুদ্ধিতে যাকে সবচেয়ে ভালো মনে হয় তার হাতেই পিতা কন্যা সম্প্রদান করবার ইচ্ছা করেন।

সর্গের শেষে রত্নসেনের সঙ্গে গন্ধর্বসেনের যখন সাক্ষাৎ ঘটছে বন্দী দশা থেকে রত্নসেনের মুক্তির পর তখন রত্নসেন বলছেন—

..... তুমি মোর পিতাতুল্য সিংহল ঈশ্বর।
পুত্রের বন্ধনে তাএ কিবা অপরাধ।
আগে পুত্র শাস্তি পায় পশ্চাতে প্রসাদ॥
অপরাধ কৈলে পুত্র শাস্তি পায় আগে।
পশ্চাতে সান্তায় দিয়া যে দান মাগে॥

এ উক্তিতে যে রত্নসেনকে পাচ্ছি সে রত্নসেন জায়সীর রত্নসেনের মত দেবোপম, কুবেরের মত ঐশ্বর্যশালী মহৎ নায়ক নয়। আমরা তাকে পাই অতি সাধারণ মানুষের পরিবার-বন্ধনের মধ্যে স্নেহ মমতার জন্য আকুল একজন পুত্র বা জামাতা হিসাবে।

কাব্য কৌশলের দিক থেকে আলাওল জায়সীর সমকক্ষ নন একথা সত্য কিন্তু অতি সাধারণ মানুষের গৃহগত সৌজন্য এবং পরিবার বন্ধনের মধ্যে স্নেহ মমতার কোলাহল এবং অভীপ্সার যে সমস্ত চিত্র তিনি এঁকেছেন তা তাকে আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করেছে। মূল থেকে এ ব্যতিক্রম আলাওলকে, সে যুগের পক্ষে যতটা সম্ভব, জনসাধারণের কবি করেছে। রাজার স্তুতিগান করেও তিনি জনসাধারণের আগ্রহ এবং চৈতন্যের মধ্যে নিজেকে জাগ্রত রেখেছিলেন।

টীকা

১। রামচন্দ্র শুক্লর সর্গ-বিভাগ অনুসারে এ-অংশটি ষোড়শ সর্গের। নামকরণ—'সিংহল-দ্বীপ-খণ্ড'। (জায়সী গ্রন্থাবলী : রামচন্দ্র শুক্ল : নাগরী প্রচারিনী সভা, বারানসী ২০১৬ বিক্রমাব্দ।)

২। রত্নসেনের গুণাবলী ব্যাখ্যায় জায়সী তাকে তুলনা ক'রেছেন বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে, গোপীচন্দ্রের সঙ্গে, ভর্তৃহরির সঙ্গে, গোরক্ষনাথ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বিক্রমাদিত্য ছিলেন অবন্তীর রাজা 'সিংহাসন বত্তিসি' তে যার উদার্য্য ও ঐশ্বর্য্য

বর্ণনা করা হ'য়েছে। হরিশচন্দ্র—পৌরাণিক যুগের খ্যাতিমান নৃপতি যিনি সত্যবাদিতা ও ত্যাগের জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। বঙ্গদেশের নৃপতি গোপীচন্দ্র যোগ-পন্থা অবলম্বন করে রাজ্যত্যাগ করেছিলেন। ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীর রাজপুত্র ছিলেন। স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতার পরিচয় পেয়ে রাজ্যত্যাগ করেছিলেন। গোরাক্ষনাথ একজন সিদ্ধা ছিলেন। যোগপন্থীদের নায়ক হিসেবে পরিচিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন গোরাক্ষনাথের গুরু।

৩। বসন্ত পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী-মাঘ মাসের পঞ্চম দিবসে অনুষ্ঠিত বসন্ত উৎসব। এ উৎসব একই সঙ্গে ঋতু-উৎসব এবং মদন-উৎসব। পঞ্চম কথাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বসন্তকালে প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত ক'রে কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করে। তা ছাড়া কামদেবের শর-সংখ্যা হল পাঁচটি।

৪। রামচন্দ্র শুক্লর সর্গ-বিভাগ অনুসারে এ-অংশটি অষ্টাদশ সর্গের।

৫। Chancer's Major Poetry. Edited by Albert C. Bangli, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1963, page 75.

৬। হরিণকে সন্ত্রস্ত ক'রে চাঁদের গতিবিধি সহজ করবার জন্য।

৭। A. G. Shirreff 'সমৃদ্' এর অর্থ ক'রেছেন উৎফুল্ল। তা'তে চরণটির অর্থ হয়—হে পদ্মাবতী, তুমি উৎফুল্ল এবং বুদ্ধিমতী।

৮। শুক্লর সর্গ-বিভাগ অনুসারে এ-অংশটি ঊনবিংশ সর্গের। নামকরণ—'পদ্মাবতী—সুআ-ভেঁট-খণ্ড'।

৯। 'কঞ্চন-করী'—শুক্লর পাঠ। গ্রীয়ারসনের পাঠ—'কঞ্চন-কলা—বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

১০। এখানে একই সঙ্গে দীপ এবং দ্বীপ উভয় অর্থই বর্তমান।

১১। শুক্লর সর্গ-বিভাগে বিংশ সর্গ।

১২। শুক্লর সর্গ-বিভাগ অনুসারে একবিংশ সর্গ। নামকরণ—'রাজা-রত্নসেন-সতী-খণ্ড'।

১৩। শুক্লর সর্গ-বিভাগে দ্বাবিংশ সর্গ।

১৪। শিব কর্তৃক নিহত গজাসুরের চর্ম।

১৫। শুক্লর সর্গ-বিভাগে ত্রয়োবিংশ সর্গ। নামকরণ—'রাজা-গঢ়-ছেঁকা-খণ্ড'।

১৬। আগ্রহী পাঠক রামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত 'পদমাবত' কাব্যের ভূমিকাংশের অলঙ্কার অধ্যায়টি পাঠ করে দেখতে পারেন। (পৃষ্ঠা ১০০—১১৬)

১৭। শুক্লর সর্গ-বিভাগে চতুর্বিংশ সর্গ।

১৮। শুক্লর সর্গ-বিভাগে পঞ্চবিংশ সর্গ।

১৯। Bibliotheca Indica, New Series, Nos. 877, 920, 951, 1024, 1127 & 1273, Calcutta, Asiatic Society. 1911. (পৃষ্ঠা ৫৭৩)

২০। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ।

২১। বিহারের বাঁকিপুরের নিকটে পীর ইয়াহিয়া মানেরির দরগা শরীফে রক্ষিত 'পদুমাবতে'র প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি।

২২। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে 'রামভক্তিপাখা'র সর্বপ্রধান কবি।